**This book is part of the
Carey Library and Research Centre
at Serampore College.**

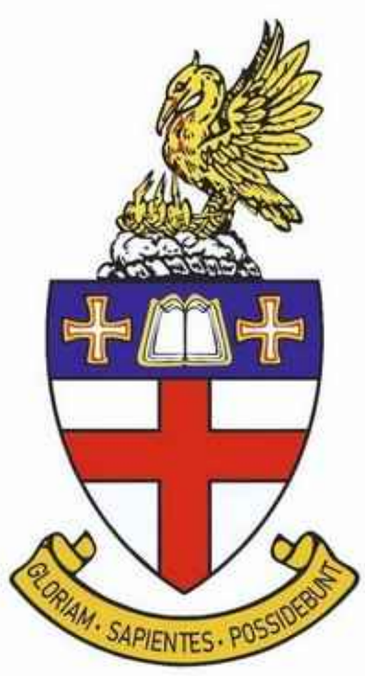

**This is a reproduction of a library book
that was digitized at the CLRC,
Serampore.
The information in this book is freely
available to the public and can be
quoted with proper reference.**

The use of this document may be subject
to the Copyright Law of India or to
site license or other rights management
terms and conditions. The person
using this document is liable for any
infringement.

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

পলাশীর পরে বাংলা

পলাশীর পরে বাংলা

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

মহামায়া সাহিত্য মন্দির
সেওড়াফুলী

প্রথম সংস্করণ
১লা বৈশাখ, ১৪০০
(১৪ই এপ্রিল, ১৯৯৩)

প্রকাশক
শ্রীঅচীনকুমার মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক, মহামায়া সাহিত্য মন্দির
৬, চ্যাটার্জী পাড়া লেন
সেওড়াফুলী ৭১২২২৩
হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ

মুদ্রণ
শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স
৩২, বিডন রো
কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০০০৯

২৫ টাকা

স্বর্গতঃ ডঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (মেজদা)-এর

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

রচনা পরিচিতি

পলাশীর পরে বাংলা	ঃ	অপ্রকাশিত
আঠারো শতকের বাংলা গদ্য	ঃ	শীত সংখ্যা। ১৩৯০-এর অনুষ্টুপে প্রকাশিত
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের পুঁথি	ঃ	রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকার ১৭ বৎসর, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৮৬ প্রকাশিত।
আঠারো শতকে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা	ঃ	অপ্রকাশিত।
শ্রীরামপুর মিশন ও নব্যধারায় শিক্ষার প্রসার	ঃ	বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজন গ্রন্থে সঙ্কলিত।
প্রসঙ্গ কলকাতা	ঃ	প্রতিভাস পত্রিকার ফেব্রুয়ারী ১৯৯০-এর সংখ্যায় কলকাতার তিনশ বছর নামে প্রকাশিত।
শ্রীরামপুর সঞ্চয় ব্যাঙ্ক	ঃ	১৯৭৭ সালের ঐতিহাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত।
রামরাম বসুর ধর্মচিন্তা	ঃ	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ৯২ বর্ষ, ১৩৯২, ১-২ সংখ্যায় প্রকাশিত।
পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	ঃ	ইতিহাস, খণ্ড ৬, সংখ্যা ৪, ১৩৮০তে প্রকাশিত।

বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধের অনেকগুলি নানা পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি বাংলার নবজাগরণ বলে চিহ্নিত সময়ের পূর্বাহ্ণ থেকে ঊষাকালের মধ্যে বাংলার সমাজজীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীকালে বাংলার ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতির চিত্রও তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে প্রবন্ধগুলিতে।

মহামায়া সাহিত্য মন্দির নানা সংকটের মধ্য দিয়ে বিগত ছয় দশক ধরে বাংলার শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিরলসভাবে সেবা করে আসছে। পুনর্গঠিত প্রতিষ্ঠানটির প্রকাশন বিভাগ গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

দি শিবদুর্গা প্রেসের শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সযত্নে বইটি ছেপেছেন, তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীঅরুণচাঁদ দত্তকে মুদ্রণ তত্ত্বাবধানের জন্য এবং শ্রীবিনয়ভূষণ রায়কে বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা করার জন্য।

গ্রন্থে আলোচিত বক্তব্যের প্রতি সুধী সমাজের সচেতন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে শ্রম সার্থক মনে করব।

৬, চ্যাটার্জী পাড়া লেন
সেওড়াফুলী ৭১২২২৩
১লা বৈশাখ, ১৪০০

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

* বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজন

মুনশী রামরাম বসু

উইলিয়াম কেরী (পুস্তিকা)

একটি দুষ্প্রাপ্য বাংলা গদ্য পুঁথি ঃ বেদান্তসার (সম্পাদিত)

বড় সাধ বড় সেবা (উইলিয়াম কেরী)

বাংলা হরফ শিল্পের পুরোধা পঞ্চানন, মনোহর ও কৃষ্ণচন্দ্র (যন্ত্রস্থ)

Raja Rammohan Roy and his contemporaries (catalogue)

* **Missions in India (catalogue)**

Carey Library Pamphlets : Religious Series (catalogue)

* **William Carey and Serampore**

* **William Carey and Serampore (booklet)**

Hannah Marshman

* **William Carey and Serampore (booklet, revised edn.)**

Felix Carey

---

* মুদ্রণ নিঃশেষিত

সূচীপত্র

পলাশীর পরে বাংলা	...	১
আঠারো শতকের বাংলা গদ্য	...	২২
বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের পুঁথি	...	৪২
আঠারো শতকে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা	...	৫০
শ্রীরামপুর মিশন ও নব্যধারায় দেশীয় শিক্ষার প্রসার	...	৬৮
প্রসঙ্গ কলকাতা	...	৮৯
শ্রীরামপুর সঞ্চয় ব্যাঙ্ক	...	৯৭
রামরাম বসুর ধর্মচিন্তা	...	১০৭
পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	...	১২৩

পলাশীর পরে বাংলা

পলাশীর যুদ্ধ বা পলাশীর প্রহসন (১৭৫৭) বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ যুগের অবসান ঘটায়। পরবর্তী সময় অর্থাৎ উনিশ শতক বাংলার নবজাগরণের কাল বলে চিহ্নিত। আঠারো শতকের ওপর কালিমালেপন করে বলা হয়েছে অন্ধকার যুগ। প্রচারের দ্বারা এই ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। প্রচলিত ইতিহাস আঠারো শতককে ফতোয়া দিয়ে বলেছে, "...mental and moral condition of the people marked by stagnation and Inertia."[১] তোতাপাখীর মত আমাদের বলতে শেখানো হয়েছে, "আমরা ছিলুম নিঃস্ব, অসহায়, আর অজ্ঞ, পশ্চিমই এনেছে আমাদের জন্য আলো, আমাদের মানুষ করেছে।"[২] জনৈক প্রাবন্ধিক এরূপ ধারণাকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন, "১৮০০-র আগে অন্ধকার তার পরেই আলো, এ ঘটনা নাটক, উপন্যাসে সম্ভব হতে পারে, ইতিহাসে নয়।"[৩] অনেক ঐতিহাসিকও এই ধারণার বিপরীত মত পোষণ করেন। একজন বলেছেন, "upto 1800, India and China remained in the upper edge in the newly emerging global balance of power and trade."[৪] অনেকে মনে করেন বৃটিশ কোম্পানী স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভুল তথ্য প্রচার করে ইতিহাস বিকৃত করেছে। এই বিষয়ে ভারতীয় ইতিহাসবিজ্ঞদের তীব্র সমালোচনা করে আলভারেজ বলেছেন, "One is amazed to discover how our recent historians have had the audacity to construct histories on the most slender of data sources. Many of the major themes have already been outlined and set forth despite the fact that the large portion of archival meterials still remain undesiphered in local Indian languages in differnt libraries, private or public in varions parts of the country."[৫] আচার্য নীহার রায় ভারতীয় ইতিহাসের জন্য বিদেশী উপাদানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা সম্পর্কে সাবধান করে বলেন, "প্রাচ্যের ইতিহাস পাশ্চাত্যের কাঠামোয় করা ঠিক নয়। প্রাচ্যকে বিচার প্রাচ্যের কাঠামোয় করা উচিত।"[৬] আঠারো শতাব্দীর শেষার্ধের অর্থাৎ পলাশীর পরে বাংলার আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনায় এই উপদেশ মনে রাখা উচিত।

পলাশীর পরে বাংলার ইতিহাসের পটভূমিতে আছে প্রাক পলাশী বাংলার ইতিহাস। সে সময়টা বাংলার গৌরবময় যুগ। ঔরঙ্গজীব এই সময়ের বাংলাকেই বলেছিলেন 'Paradise of Nations'. পলাশীর পরেও

সমৃদ্ধশালী বাংলার রূপ একেবারে অবলুপ্ত হয়নি। ঐতিহাসিক ডাও বলেছেন, "সিরাজের মৃত্যুর (১৭৫৭) পর যারা বাংলার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পাড়ি দিয়েছে তাদের সাক্ষ্যে জানা যায় বাংলা তৎকালীন অন্যতম জনবহুল, ঐশ্বর্যশালী এবং কৃষিকার্যে সমৃদ্ধ দেশ। অভিজাত ও ধনী বণিককুল ঐশ্বর্য বিলাসে গা ভাসিয়ে থাকে, ছোট চাষী ও উৎপাদকের রোজগারও বেশ ভালো। তারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করে।[৭] বাংলার গরীব চাষীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অবসান সিরাজের মৃত্যুর সঙ্গেই হয়।

বাংলার সমৃদ্ধশালী নবরূপের সূচনা হয় ১৭০০ সালে। এই বছর ডিসেম্বরে মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার দেওয়ানী লাভ করে দাক্ষিণাত্য থেকে বাংলায় আসেন। ঔরঙ্গজীবের দৌহিত্র আজিমুশ্‌সান তখন বাংলার সুবেদার। তিনি ছিলেন অলস প্রকৃতির আর লোভী। মুর্শিদকুলীর নিয়োগ তাঁর পছন্দ হয়নি। তাঁর লোকেরা নতুন দেওয়ানকে অপসারণ করার চেষ্টা করেন। অবস্থা বুঝে মুর্শিদকুলী ঢাকা থেকে রাজধানী মুক্‌সুদবাদে সরিয়ে নিয়ে আসেন এবং সেখানে রাজধানী গড়ে নাম দেন মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদকুলী ছিলেন সৎ, সাহসী ও দক্ষ প্রশাসক। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। দিল্লীর সম্রাট সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ১৭০৭ সালে সহকারী সুবেদার নিযুক্ত করেন। সুবেদার দুর্বল প্রকৃতির হওয়ায় তিনিই হন বাংলার প্রকৃত প্রশাসক। পরে তিনি বাংলার সুবেদার হন। তাঁর সময় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে দিল্লীর হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়। মুর্শিদকুলী নিয়মিত কর দিয়ে দিল্লীকে সন্তুষ্ট রাখতেন। ১৭২৭ সালে তাঁর মৃত্যু হলে জামাতা সুজাউদ্দিন বাংলার সুবেদার হন এবং পারিবারিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। সুজাউদ্দিন অনেকটা উদার ছিলেন। এই সময় (১৭৩৩) বিহার স্থায়ীভাবে বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়। সুজাউদ্দিনের রাজত্বকালে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি আরও বাড়ে। চালের দাম অনেক কমে এবং শায়েস্তা খাঁর রেকর্ড স্পর্শ করে অর্থাৎ টাকায় হয় আট মণ।[৮] ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকরাও সুজাউদ্দিনের রাজত্বের কোন খুঁত বার করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর শান্তিপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের বীজ রোপন করে কুচক্রী অমাত্যেরা। ১৭৩৯ সালে তাঁর মৃত্যুর পর বাংলার মসনদে বসেন পুত্র সরফরাজ। তিনি ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির, সেই সুযোগে অন্তর্কলহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। রাজ্যে অশান্তি ছড়িয়ে পড়লে বিহার থেকে ১৭৪০ সালে আলিবর্দী এসে গিরিয়ায় সরফরাজকে পরাজিত করেন এবং বাংলার মসনদ দখল করেন। দক্ষ প্রশাসক আলিবর্দী শক্ত হাতে শাসন দণ্ড ধরেন এবং দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু তাঁর ওপর আঘাত আসে বাইরে থেকে। ১৭৪২ সাল থেকে প্রতি বছর

বর্গী নামে মারাঠা দস্যুরা বাংলায় এসে লুটপাট সুরু করে এবং আফগান বিদ্রোহও আলিবর্দীকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। মারাঠা দস্যুদের জন্য বাংলার শান্তি ও নিরাপত্তা বিশেষভাবে বিঘ্নিত হয়। তবে তা ছিল ঝোড়ো হাওয়ার মত, পশ্চিমাংশে কালবৈশাখীর ঝড়ের মত আসত ও চলে যেত।[৯] সমগ্র বাংলার ওপর বর্গী আক্রমণের কোন ছাপ পড়েনি। বর্গীরা সাধারণতঃ গঙ্গা পার হত না। ১৭৫১ সালে আলিবর্দী বার্ষিক বার লক্ষ টাকা চৌথ দেবার স্বীকৃতি দিয়ে মারাঠাদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন, দেশ মারাঠাদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়।

আলিবর্দীর শাসনকালে (১৭৪০-৫৬) সামগ্রিকভাবে দেশে শান্তি বজায় থাকলেও শেষের দিকে চাপা অশান্তির আঁচ পাওয়া যায়। তাঁর উত্তরাধিকার নিয়ে পারিবারিক ষড়যন্ত্র ও কলহ তাঁর জীবিতকালেই সুরু হয়ে যায়। তিনি দৌহিত্র সিরাজদ্দৌল্লাকে নিজের উত্তরাধিকার মনোনীত করেন এবং ১৭৫৬ সালে তাঁর মৃত্যু হলে, সিরাজদ্দৌলা বাংলার মসনদে বসেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্কলহ প্রকট হয়ে ওঠে। সিরাজদ্দৌলা মাত্র ১৪ মাস (১০ই এপ্রিল ১৭৫৬ থেকে ২৩ জুন ১৭৫৭ পর্যন্ত) বাংলার নবাব ছিলেন! নবাব পরিবারের ঝগড়া, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা বাংলার ইতিহাসে কালিমালিপ্ত অধ্যায়।

বাংলার এই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল অবস্থায় ইউরোপীয় বণিকদের বিশেষ করে ইংরেজদের উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। শিল্প সমৃদ্ধ বাংলার ওপর ইউরোপের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে অনেক আগেই এবং ইউরোপের বাজারে বাংলার পণ্যের বিপুল চাহিদা মেটাবার জন্য দলে দলে ইউরোপীয় বণিক ষোড়শ শতাব্দী যেতেই বাংলায় আনাগোনা সুরু করে। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজের পর আসে ফরাসী ও ইংরেজ। ১৭২৫ সালে ফরাসী নৌসেনাপতির বিবরণে পাওয়া যায়—গঙ্গার তীরে ইউরোপীয় বণিকরা তিনটি সুন্দর সহর গড়ে তুলেছে। এই তিনটি হল ইংরেজদের কলকাতা, ফরাসীদের চন্দননগর আর ওলন্দাজ-পর্তুগীজদের চুঁচুড়া-ব্যাণ্ডেল। তিনটির মধ্যে কনিষ্ঠ হলেও গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত কলকাতার গুরুত্ব তখন দ্রুত বাড়ছিল। মারাঠা দস্যুদের আক্রমণের সময় কলকাতার বাণিজ্য কেন্দ্রের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়, কারণ মারাঠারা গঙ্গা পার হয়ে পূর্বতীরে আসত না, তাই কলকাতা নিরাপদ হওয়ায় হুগলী-সাতগাঁর বণিকদের অনেকে কলকাতায় চলে আসে। বাণিজ্য প্রসারে ইংরেজদের হয় সুবিধা।

আঠারো শতকের প্রথম দিকে ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে নবাবের বিশেষ কোন সংঘাত হয়নি, কারণ দক্ষ প্রশাসক নবাবের শক্তি ছিল সুসংহত। ইউরোপে ইংরেজরা ফরাসীদের সঙ্গে সব সময় যুদ্ধে রত থাকলেও নবাবের

কঠোর নির্দেশে তারা এদেশের মাটিতে পরস্পরের মধ্যে লড়াই করতে পারেনি। ১৭৪৬ সালে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ হলেও আলীবর্দী বাংলায় তাদের যুদ্ধ করতে দেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংরেজরা কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ করে নিজেদের শক্তিকে অনেকটা সুসংহত করে।

১৭৫৬ সালে আলীবর্দীর মৃত্যু হলে বাংলায় নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। নতুন নবাব সিরাজদ্দৌলার বয়স তখন মাত্র তেইশ বছর। রাজনীতিজ্ঞানশূন্য সিরাজের চতুর্দিক ছিল ষড়যন্ত্রকারী শত্রুতে ভরা, এদের মধ্যে অনেকে সিংহাসনের দাবীদার ছিল। সিংহাসনে আরোহণ করেই সিরাজকে বিদ্রোহী সৌকতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে হয়। কিন্তু পথিমধ্যে ইংরেজদের বাড়াবাড়ির খবর পেয়ে ফিরে আসেন। উদ্ধত ইংরেজ বণিকদের শায়েস্তা করার জন্য ১৭৫৬ সালে তিনি কলকাতা আক্রমণ করেন। যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজিত করে কলকাতার দুর্গ ধ্বংস করে দেন। তারপর তিনি পূর্ণিয়া গিয়ে বিদ্রোহী সৌকত জংকে পরাজিত করেন। সিরাজের এই সাফল্য তাঁর শত্রুদের খুব চিন্তিত করে এবং তারা বুঝতে পারে শক্তির সাহায্যে তাঁকে সরানো যাবে না। সিরাজের বিরুদ্ধে তারা নানাভাবে অপ-প্রচার চালায় এবং ষড়যন্ত্র করে তাঁকে সরাবার পথ খোঁজে।

ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের বিরোধ খুব সামান্য কারণে হয়নি। দেশের রাজশক্তিকে বারবার প্রতারণা ও উপেক্ষা করে বিদেশী বণিকরা নবাবকে উত্তপ্ত করে তোলে। তারা আশা করেছিল গৃহবিবাদে বিব্রত নবাব তাদের কিছু করতে পারবে না, কিন্তু কলকাতার যুদ্ধে নবাবের শক্তির পরিচয় পেয়ে বোঝে শক্তির প্রতিযোগিতায় তারা নবাবের সঙ্গে পেরে উঠবে না, তাই বিশ্বাসঘাতকদের দলে ভিড়ে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেয় এবং কলকাতার পরাজয়ের কথা মনে রেখে নিজেদের শক্তি বাড়াবার চেষ্টা করে। সিরাজের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে তারা মুখ্য ভূমিকাও নেয়। বন্দী অবস্থায় বন্ধ ঘরে কয়েকজন ইংরেজ সৈন্যের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে "অন্ধকূপ হত্যা" বলে সিরাজের গায়ে কালী ছেটাবার জন্য ইংরেজরা তারস্বরে চীৎকার সুরু করে। রোমহর্ষক কাহিনী রচনা করে দীর্ঘদিন ধরে মানুষকে বিশ্বাস করিয়ে এসেছে যে অন্ধকূপের মধ্যে রেখে নৃশংসভাবে সিরাজ ইংরেজ সৈন্যদের মেরেছে। ঘটনাটি যে সম্পূর্ণ বিকৃত তা প্রমাণ করে ঐতিহাসিক নিখিল-নাথ রায় বলেছেন, "অন্ধকূপের মত সীমিত কক্ষ না হইয়া কোন বিশাল কারাগৃহে তাহাদের আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও বন্দীরা ঐরূপই কষ্ট ভোগ করিত।.....যুদ্ধের পর বন্দীদিগকে রাজপ্রাসাদে রাখিয়া রাজভোগে পরিতৃপ্ত করিবার রীতি কোন দেশে কোন কালে দেখা যায়নি, এখানে কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছিল সত্য। কারাগারে আহত সৈন্যের মৃত্যুর ঘটনা

ইতিহাসে বিরল নয়। তাই আবদ্ধ বন্দীদের কয়েকজনের মৃত্যু, আর বন্দীদের কষ্টভোগকে অতিরঞ্জিত করে অন্ধকূপ নাম দেওয়া ইতিহাসের বিকৃতি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।"[১০]

১৭৫৬ সালে অক্টোবর মাসে মাদ্রাজ থেকে আরও সৈন্য এনে ইংরেজরা কলকাতা আবার দখল করে নেয়। নিজের ঘরোয়া ব্যাপারে সিরাজ বিব্রত হয়ে পড়ায় ইংরেজদের সুবিধামত শর্তে সন্ধি করেন। পারিবারিক ষড়যন্ত্র ও বিরোধে বিভ্রান্ত সিরাজের দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে নিষেধ সত্ত্বেও ইংরেজরা ফরাসী চন্দননগর আক্রমণ করে এবং দখল করে নেয়। ফরাসীরা এই সময় দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটকের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় চন্দননগর রক্ষা করতে পারেনি। চন্দননগর দখল করার পর ইংরেজরা ফরাসীদের বাংলা থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য নবাবের ওপর চাপ দিতে থাকে। অন্তর্দ্বন্দ্বে উত্যক্ত নবাব ইংরেজদের ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে পারেন না, চুপ করে থাকেন। চতুর ইংরেজ বণিকরা সিরাজের অসহায়ত্ব দেখে তাঁকে সরিয়ে নিজেদের মনোমত কাউকে বাংলার সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়। কিন্তু ইংরেজরা জানত যুদ্ধে নবাবকে হারানো তাদের সাধ্যের অতীত, তাই নবাবের সেনাপতিকে হাত করে যুদ্ধের অভিনয়ে সিরাজকে হারাবার পরিকল্পনা করে। সিরাজের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর ছিলেন ভীষণ লোভী। ইংরেজরা তাঁকে বলে যুদ্ধের সময় নিষ্ক্রিয় থেকে ইংরেজদের জেতাতে পারলে মীরজাফরকে তারা সিংহাসনে বসাবে। এই সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্রে রাজবল্লভ, জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখও .যোগ দেয়। পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। ইংরেজরা কিছু দেশপ্রেমী নবাব সৈন্যকে হত্যা করে প্রায় বিনা বাধায় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত ও হত্যা করে। সিরাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মানুষের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি ও নিরাপত্তারও শেষ হয়। আর সেই সঙ্গে বিপুল ঐশ্বর্যশালী বাংলাকে ইংরেজরা ভিখিরীর জাতে পরিণত করার কাজ সুরু করে।

পলাশীর প্রহসনের পর ইংরেজদের সাময়িক শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, বাণিজ্যে পায় বাধাহীন অধিকার আর ঐশ্বর্য লুণ্ঠনে আসে অবাধ সুযোগ। কিন্তু দেশ শাসনের যেমন দায় রইল না তেমনি দেশবাসীর সুখদুঃখ দেখার কোন দায়িত্বই ইংরেজ কোম্পানীর ওপর বর্তায় না, ইংরেজ নিযুক্ত নবাবের ওপর থাকে সেই ভার। পলাশীর পরে কয়েক বছর ধরে চলে বাংলার মসনদ নিয়ে নবাব পরিজনের মধ্যে মারামারি, লাঠালাঠি আর ইংরেজরা চালায় অবাধ লুণ্ঠন ও প্রজা নিপীড়ন। ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান ও পলাশী ষড়যন্ত্রের নায়ক ক্লাইভ ১৭৬০ সালে ইংলণ্ডে ফিরে যাবার আগে বাংলার

হর্তাকর্তা বিধাতা হয়ে ওঠেন। দুর্বল মীরজাফর ইংরেজ প্রভুদের অর্থলালসা মেটাতে পারে না। অত্যাচারে জর্জরিত জমিদারেরা নবাবকে খাজনা দিতে অপারগ হয়। কোম্পানীর কর্মচারীরা এতো ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণ করে যে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থাও খারাপ হয়ে যায়। কোম্পানী নবাবের ওপর টাকার জন্য চাপ দিতে থাকে। মীরজাফরকে অসহায় দেখে মীরকাশিমের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাঁকে বাংলার নবাব করে দেয়। মীরকাশিম নবাবের কোষাগার ফাঁকা দেখে চমকে যান এবং শঠ ইংরেজদের খেলাটা বুঝতে পারেন। তিনি গোপনে চেষ্টা করেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার। কিন্তু টাকা আর শক্তি তখন ইংরেজদের কুক্ষিগত, তাই মীরকাশিমের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁকে সরিয়ে ইংরেজরা আবার মীরজাফরকে নবাবের গদিতে বসায় (১৭৬৩)। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমকে পরাজিত করে ইংরেজরা বাংলায় মুসলমান শক্তির পুনরুত্থানের আশাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দেয়। ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ বাংলার গভর্নর হয়ে আবার ফিরে আসেন। দিল্লীর নবাবের ফরমান নিয়ে ইংরেজরা বাংলায় দ্বৈত শাসন চালু করে। এই শাসন ব্যবস্থায় ইংরেজরা শুধু খাজনা আদায় করবে আর দেশের ভালো মন্দ দেখার ভার থাকবে নবাবের ওপর। ইংরেজ মনোনীত রেজা খাঁ কর আদায়ের নামে চালায় অমানুষিক অত্যাচার। ১৭৬৭ সালে দেশের অবস্থা আরও খারাপ করে দিয়ে ক্লাইভ দেশে ফিরে যান। আর্থিক অবস্থার শোচনীয় পরিণতি দেখে নতুন গভর্নর ভেরেলেস্ট সব জেলাতেই কর আদায়ের জন্য ইংরেজ তত্ত্বাবধায়ক পাঠান এবং তাতে দেশের পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। অত্যাচার আর নিপীড়নে দেশের কৃষিজীবী মানুষ যখন পর্যুদস্ত তখন খরা আর অজন্মায় রক্ষকহীন বাংলায় ঘটে সবচেয়ে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ ও মহামারী (১৭৭০)। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' (১২৭৬ বাংলা সন) নামে পরিচিত। এই ভয়াল মন্বন্তর ও তার অনুগামী খরা বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক নিঃশেষ করে দেয়। আর যারা কোনরকমে বেঁচে থাকে তারা অনাহারে আর অর্ধাহারে হয়ে যায় পঙ্গু আর ভিখিরী। অত্যাচারী ইংরেজদের আশা পূরণ হয় ভাগ্যের নিষ্ঠুর অনুশাসনে সম্পদশালী বাঙ্গালী ভিখিরীর জাতে পরিণত হলে।

বাংলাদেশের দুরবস্থা চরম পর্যায়ে গেলে বৃটিশ পার্লামেন্টের টনক নড়ে। ১৭৭৩ সালে পার্লামেণ্ট কোম্পানী শাসনের ওপর রেগুলেটিং এ্যাক্ট চাপায়। ১৭৭২ সালে ওয়ারেণ হেষ্টিংস কোম্পানী সরকারের প্রশাসনকে সুসংহত করার ভার নিয়ে বাংলায় আসেন। ১৭৫০ সালে হেষ্টিংস প্রথম ভারতে আসেন এবং দীর্ঘদিন এদেশে থেকে ভারতীয়দের সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। রেগুলেটিং এ্যাক্টের বলে তিনি হন প্রথম গভর্নর জেনারেল

এবং তিনি ভারতে বৃটিশশক্তির মূল সুদৃঢ় করেন। তাঁর শাসনকালে প্রধানতঃ প্রশাসন, বিচার, কর আদায়, বাণিজ্য প্রভৃতির বিশেষ উন্নতি হয়। ১৭৭৫ সালে হেষ্টিংস ঘোষণা করেন বাংলার ওপর নবাবের আর কোন অধিকার নেই। 'মুর্শিদাবাদ থেকে কোষাগার তিনি কলকাতায় স্থানান্তর করেন। তাঁর শাসনকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাংলায় মুদ্রণের প্রচলন যা নতুন যুগের সূচনার পটভূমি তৈরী করে।

১৭৭৬ থেকে ১৭৯৩ পর্যন্ত গভর্নর জেনারেলরূপে শাসন করেন লর্ড কর্নওয়ালিস। তিনি ১৭৯২ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে গ্রাম-বাংলার আর্থিক কাঠামোকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেন। এরপর উল্লেখযোগ্য গভর্নর জেনারেল হলেন লর্ড ওয়েলেস্‌লি, লর্ড হেষ্টিংস, লর্ড বেন্টিঙ্ক, লর্ড ডালহাউসী প্রমুখ দক্ষ প্রশাসকবৃন্দ। এঁদের শাসনকালে ইংরেজ কোম্পানী সরকারের সাম্রাজ্য একদিকে যেমন বাড়ে অপরদিকে তেমনি হয় সুসংহত।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা

পলাশীর পরে ইংরেজ বণিকরা সবচেয়ে বড় আঘাত হানে বাংলার কৃষি ও শিল্পের ওপর। পূর্ববর্তীকালে বাংলায় যে সব বিদেশী এসেছে তারা স্থায়ীভাবে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কালক্রমে এদেশ তাদের মাতৃভূমি হয়েছে। নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে এদেশের স্বার্থ মিশিয়ে ফেলার ফলে এদেশের উন্নতির জন্য প্রাণপাত করে। ইউরোপীয় বণিকদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু এদেশের ঐশ্বর্য লুঠ করে নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধ করা। ইংরেজরা আমাদের দেশে তাই কখনও আপন হয়নি। ইংরেজ সরকার দ্রুত উন্নতিশীল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে এদেশের কৃষি ও শিল্পকে উন্নত করার চেষ্টা করেনি। বরং সুপরিকল্পিতভাবে এদেশের উন্নত মানের শিল্পকে ধ্বংস করে এবং অবহেলা ও আর্থিক অবরোধে এদেশের কৃষির অবস্থা শোচনীয় করে তোলে।

কৃষি ও শিল্প এ দুটির ওপরই সুসমৃদ্ধ বাংলার সুদৃঢ় আর্থিক কাঠামো দাঁড়িয়েছিল, আর এদের ওপর নির্ভর করেই বাংলার কোটি কোটি কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীর ছেলেমেয়েরা ছিল দুধেভাতে। অল্পে তৃপ্ত সুজলা সুফলা বাংলার গ্রাম সুখ ও শান্তিতে সদা প্রফুল্ল ছিল (রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও)। পরিশ্রমী, শান্ত, সরল গ্রামের মানুষ প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে যেমন অধিকার সচেতন ছিল না, তেমনি ছিল বাইরের জগৎ সম্পর্কে অনাগ্রহী। প্রকৃতির দানের প্রাচুর্য বাংলার মানুষকে প্রকৃতির ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল করে আর ধর্মের অনুশাসন স্বাভাবিকভাবেই তাদের সামাজিক জীবনকে বেঁধে ফেলে।

আঠারো শতকে বাংলার কৃষি ছিল সুউন্নত এবং উৎপাদনের প্রাচুর্য ছিল বিস্ময়কর। ভারত ও ভারতের বাইরে বাংলার কৃষিজাত দ্রব্য প্রচুর রপ্তানী হত। ইংরেজ কোম্পানী বিপুল পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্য (বিশেষ করে তূলা ও রেশম) প্রতি বছর বাংলা থেকে নিয়ে যেত, তবু বাংলার কৃষি সম্পর্কে অপপ্রচার করতে তাদের বাধেনি। যেমন, ১৭৫৩ সালে রবার্ট ওরমে লেখেন, "যদি ঠিকমত চাষ করা হয়, তবে বাংলায় যত পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী হত।"[১১] সে যুগের বাংলার কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগত মান পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় মন্তব্যটি ভিত্তিহীন। উক্তিটিতে বাংলার কৃষির অনগ্রসরতার প্রতি যে ইঙ্গিত আছে তা বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বাংলাকে হেয় করার অপপ্রয়াস। এই সময়ের কৃষির অবস্থা পর্যালোচনা করলে বিষয়টি সহজে বোঝা যায়।

পাহাড় থেকে নেমে আসা অসংখ্য নদী বাহিত পলি দিয়ে গড়া বাংলার বিশাল সমভূমি। জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত পর্যাপ্ত বৃষ্টিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হত। এদেশের কৃষকেরা চাহিদার তুলনায় অনেক বেশী শস্য উৎপন্ন করত, ফলে সব জমিতেই আবাদ করার বিশেষ প্রয়োজন হয়নি এবং কিছু জমি অনাবাদী থাকে সেই কারণে। বাংলার প্রধান ফসল ধান বাংলায় এতো বেশী উৎপন্ন হত যে ধানের দাম অকল্পনীয়ভাবে কমে যেত এবং গরীব চাষীরা তার জন্য পরিশ্রমের যথাযথ মূল পেত না। ঐতিহাসিকেরা কিন্তু আমাদের বিভ্রান্ত করেছেন এবং বাংলার পরিশ্রমী কৃষিজীবীদের অযথা দোষারোপ করে বলেছেন এদেশের কৃষকরা এমন বেশী কিছু উৎপন্ন করত না যা দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারে এবং খাজনা মেটাতে পারে। তাই তাদের মজুরের কাজ করতে হত।[১২] ইংরেজ কোম্পানী কর আদায়ের নামে বাংলার কৃষকদের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার চালায়, সেই দোষ চাপা দেবার জন্য এরূপ তথ্যহীন উক্তি। এরূপ মন্তব্য ইতিহাসকে বিকৃত করে। শ্রীপ্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাভারতের একটি প্রাচীন পুঁথির মধ্যে সেকালের দুর্গোৎসবের একটি ফর্দ পান যাতে দেখা যায় সেকালে (১৭৮০ খৃঃ) বাংলার বর্ধমান জেলায় ধান এতো প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত যে আউস ধানের খদ্দের জুটত না।[১৩] বৃটিশ শাসনের প্রাথমিক যুগের কৃষি অবস্থা সম্পর্কে কোম্পানী সরকার যে বিবরণ দিয়েছে তা অভ্রান্ত বলে ধরার আগে বিচার বিশ্লেষণ করা ঐতিহাসিকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে মনে করা উচিত।

শুধু পরিমাণেই নয়, সে যুগের চাষীরা বহু বিচিত্র জাতের ধান উৎপন্ন করত। এই বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে বলা হয়েছে প্রতি জাতের শস্য কণা যদি ভাঁড়ে রাখা যায় তবে ভাঁড় পূর্ণ হয়ে যাবে।[১৪] তাছাড়া আঠারো শতকে

বাংলার কোন কোন অঞ্চলে বছরে তিনটি করে ফসল হত।[১৫] ইংরেজ-পূর্ব যুগের এই ধান চাষের অবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ইংরেজরা প্রচার করতে থাকে এদেশের কৃষকেরা চাষ করতে জানে না, আর পরিশ্রমী নয়। এসব উক্তির যথাযথ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন বিশেষ প্রয়োজন।

বাংলায় তখন ভালো গম চাষও হত। এই গম ওলন্দাজ উপনিবেশ ব্যাটাভিয়াতে নিয়মিতভাবে রপ্তানী হত।[১৬] পলাশীর আগে বাংলায় কৃষিবিদ্যা ও উদ্যানবিদ্যার চর্চা উন্নত মানের ছিল বলেই বৈচিত্র্যে, গুণে ও পরিমাণের দিক দিয়ে বাংলা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক অগ্রসর ছিল এবং পরবর্তী-কালের অবনতির বিবরণ থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় পরিকল্পিতভাবে বাংলার কৃষিকে হত্যা করা হয়েছে। বাংলায় তখন অপর্যাপ্ত বিভিন্ন জাতের ফল, সব্জি, মশলা প্রভৃতি উৎপন্ন হত যার পরিমাণও পরে অনেক কমে যায়। বাংলার সর্বত্রই আখ চাষ হত এবং চিনি উৎপাদনে তখন বাংলা ছিল অগ্রণী। তাছাড়া নানা জাতের ডাল, কড়াই, .তামাক, পান, সুপারি প্রভৃতিও উৎপন্ন হত প্রচুর পরিমাণে। তূলা আর তুঁতগাছের (গুটিপোকার দ্বারা রেশমের জন্য) চাষ বাংলার পৃথিবী খ্যাত বস্ত্র ও রেশমশিল্পের প্রয়োজনানুযায়ী উপাদান সরবরাহ করত। উত্তরবঙ্গের মালদহ ও অন্যান্য কয়েকটা অঞ্চলে সেসময় নীল চাষও প্রচলিত ছিল। ইংরেজ কোম্পানী এই বিপুল পরিমাণের কৃষিজাত দ্রব্যের প্রতি মোটেই আগ্রহী ছিল না, তবে কয়েকটি দ্রব্য ছাড়া যেমন, তূলা, তুঁত, নীল প্রভৃতি। কিন্তু বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের প্রতি বিরাগ ছিল সুস্পষ্ট, কারণ খাদ্যশস্য ইউরোপে রপ্তানী হবার সুযোগ ছিল কম। নীল, তূলা, পাট প্রভৃতির প্রতি আগ্রহের কারণ শিল্পজাত দ্রব্যের বাণিজ্যে বেশী মুনাফালোটার সুবিধা। কৃষকের শোষণ ছাড়া কোম্পানী বাংলার কৃষির প্রতি কোন সম্পর্ক রাখেনি এবং নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য নানা বিকৃত তথ্য সরবরাহ করেছে। অত্যাচার উপেক্ষা ও অর্থ-শোষণের দ্বারা বাংলার ঐশ্বর্যমণ্ডিত কৃষি উৎপাদনকে ইংরেজ কোম্পানী প্রায় শেষ করে দেয় এবং কৃষিজীবীদের মজুর আর ভিখিরীতে পরিণত করে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যেই। এই সঙ্গে বাংলার উন্নত কৃষি বিজ্ঞান চর্চারও অবনতি হয়। এদেশে প্রচলিত কৃষি বিজ্ঞান চর্চার কোন উল্লেখ না করেই ঐতিহাসিকরা লিখেছেন আমাদের কৃষকের এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন এবং ইংরেজরাই আমাদের বিজ্ঞান সচেতন করার চেষ্টা করে। অথচ রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যে যেমন মাঠের চাষ, শস্য লালন ও ঝাড়াই-এর বিজ্ঞান সম্মত নিখুঁত বর্ণনা আছে তেমনি আছে চাষবাসের নানান ধরনের যন্ত্রপাতির বর্ণনা। এগুলির নাম ছিল চাষাযন্ত্র। এর মধ্যে ছিল কোদালী, কাস্তে, লাঙ্গল, জোয়াল, ফাল, বিড়ে, মই প্রভৃতি। বলদ ও মহিষের সাহায্যে

কাজ চালানো হত। সার হিসাবে গোবরই প্রধানভাবে ব্যবহৃত হত।[১৭] আঠারো শতকের শেষের দিকে উত্তরবঙ্গে বসবাসকালে মিশনারী উইলিয়াম কেরী চাষের দেশীয় যন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তাদের উপযোগিতা বর্ণনা করেন।

বাংলায় নদী, খাল, বিল, দিঘী, পুকুর প্রভৃতি স্বাভাবিক জলাধারে প্রচুর পরিমাণে জল জমা থাকত এবং বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্যও সাধারণভাবে কম ছিল না। চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের সাধারণত কোন অভাব ছিল না। সেজন্য কৃত্রিম জলসেচের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। তবে বর্ষাকালের জলকে বড় বড় বাঁধ দিয়ে ধরে রাখার ব্যবস্থা বাংলার কয়েকটি জেলায় সুপ্রচলিত ছিল। বাঁধগুলি দু'রকম কাজ করত, সীমান্ত অঞ্চলে পরিখার কাজ করত এবং খরার সময় মাঠে জল সরবরাহ করত। বাঁধ থেকে জল নেবার জন্য কৃষকদের কর দিতে হত।[১৮] যে সমস্ত অঞ্চলে এরকম বাঁধ ছিল, সেখানে শীতকালেও ভালো ফসল উৎপন্ন হত। গ্রামের জমিদার, ধনী গৃহস্থ ও ব্যবসায়ীরা ছিলেন কৃষি কাজের তত্ত্বাবধানের প্রধান স্তম্ভ। কৃষকেরা এঁদের সহায়তা পেত। ইংরেজ কোম্পানীর রাজত্ব সুরু হলে এঁরা গ্রাম ছেড়ে সহরে চলে যান, ফলে কৃষকেরা সহায়হীন হয়ে পড়ে এবং সরকারি অত্যাচারে তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই বাংলার কৃষির অবস্থা খারাপ হতে থাকে।

বনজ সম্পদেও সে সময় বাংলা ছিল বিশেষভাবে সমৃদ্ধ এবং অরণ্যের প্রতি বাংলার মানুষের যে মমত্ব বোধ ছিল ইংরেজ আমলে তা দেখা যায় না। বিশাল বিশাল অরণ্য প্রচুর কাঠ সরবরাহ করত, ঘা দিয়ে তৈরী হত নৌকা, গরুর গাড়ী, আসবাবপত্রাদি, বাড়ী প্রভৃতি। সে সময় জ্বালানী হিসাবে কাঠের ব্যবহার ছিল ব্যাপক, তাই কাঠ সমাজে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীরূপে বিবেচিত হত, তাছাড়া প্রথাগত উপায়ে না হলেও উদ্যানবিদ্যার চর্চার সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নানা সুস্বাদু ফল, লাক্ষা, মোম, জীবনদাত্রী বিভিন্ন ঔষধ প্রভৃতি সরবরাহ করত উদ্যানে শোভিত বাংলার গ্রামসমূহ। নানা জাতের নয়নাভিরাম ফুলের শোভাও বাংলার প্রকৃতিকে সুষমামণ্ডিত করেছিল। সে যুগের বাংলা সম্পর্কে কবির উক্তি 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি' মোটেই অপ্রযোজ্য ছিল না। বনজ ও উদ্যানজাত দ্রব্যাদির বিশেষ গুরুত্ব থাকায় গ্রামের মানুষ বন ও উদ্যান সংরক্ষণে বিশেষ সচেতন ছিল। ইংরেজ কোম্পানী সরকারের ঔদাসীন্যে ও অবহেলায় পলাশীর পর থেকেই অরণ্য ও উদ্যানের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। আঠারো শতকের শেষের দিক থেকে উনিশ শতকে প্রথম দিকের মধ্যে উদ্ভিদ-প্রেমী উইলিয়াম কেরী এই গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি সরকারের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেন।[১৯] কেরীর প্রচেষ্টায় সরকার বনজ সম্পদের আর্থ-সামাজিক মূল্য বুঝতে পারে এবং বন সংরক্ষণে সচেতন হয়।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথমে নানাভাবে কৃষি ও কৃষক সম্প্রদায় পর্যুদস্ত হলে কৃষির অবস্থা খারাপ হয়ে যায় এবং তার মূল কারণকে আড়াল করার জন্য প্রচার করা হয় প্রচলিত পদ্ধতির জন্যই উৎপাদন আশানুরূপ হয় না। বাংলার কৃষক সমাজকে ভিখিরী করার পর থেকেই ইংরেজ সরকার অপপ্রচার সুরু করে। যেমন ১৭৮৯ সালে স্যার জনসোর বলেন, "Any man of experience could hardly believe that Bengal possessed prodigous wealth."[২০] এরূপ মন্তব্যের কারণ তিনি বলেননি।

কৃষকদের শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা করেছেন ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ। কিন্তু সেই অবস্থা কেন হয়েছে বা তার জন্য কারা দায়ী সে সম্বন্ধে কিছু বলেননি। যেমন পিটার মার্শাল বলেছেন, "Many of whom (the peasants) were too poor to extend their cultivation even though there was as yet little pressure on land, many of whom were deeply in debt and the majority would be plunged into destitution and death if the rains failed or a harvest were flooded."[২১]

সুজলা সুফলা বাংলার কৃষকদের এই শোচনীয় অবস্থা করার জন্য ইংরেজ সরকার আর তার বশংবদ জমিদারদের কি ভূমিকা ছিল তার বিস্তৃত বিশ্লেষণ হলে উনিশ শতকের ইতিহাসের রূপ পরিবর্তন হয়ে যাবে।

কৃষকদের সম্পর্কে সরকারের চূড়ান্ত অবহেলা আর নির্যাতন দেশের অনাবাদী জমির পরিমাণ বাড়াতে থাকে এবং সৃষ্টি করে ভূমিহীন চাষী ও কৃষি-মজুর বা কিষান। কিন্তু তা সত্ত্বেও উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে কৃষির পরিমাণ দ্রুতহারে বাড়তে থাকে, নিজেদের দুর্দশা বাড়লেও চাষীরা চাষের কাজে কোন অবহেলা যে করেনি তা জানা যায় কোলব্রুকের বিবরণ (১৮১৩) থেকে। তিনি লিখেছেন, "Increase of agriculture has proceeded with rapidity surpassing expectation and the greatest part of the country has already reached its limit."[২২]

ভূমিহীন কৃষক বা কৃষি-মজুরের সংখ্যা এ সময় বিপুলহারে বেড়ে যায় এবং বাংলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে ঘনবসতির রূপ নেয়। ১০০ থেকে ৫০০ জন বাস করে এমন গ্রামের সংখ্যা খুব বেড়ে যায়। পরিত্যক্ত গ্রামে যেমন পুনর্বসতি হয় তেমনি হয় নতুন জনপথের সৃষ্টি। যদিও সেসময় নিয়মানুযায়ী লোকগণনা করা হয়নি, তবু অনুমান করা যায় উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা ও বিহারের লোকসংখ্যা ছিল দু' কোটি থেকে তিন

কোটির মধ্যে।[২৩] বাংলার অধিবাসীদের বেশীর ভাগই ছিল কৃষি শ্রমজীবী। আবার ১৮১৬ সালে শুধু বর্ধমান জেলার অধিবাসীর সংখ্যা গণনা করে দেখা যায় পনের লক্ষ লোক এই জেলায় বাস করে।[২৪] বর্ধমান জেলা এই সময় সবদিক দিয়েই সুসমৃদ্ধ ছিল।

ইংরেজ প্রশাসক আর বণিকরা একদিক দিয়ে বাংলার কৃষির ক্ষতি করে আর কৃষকের দুঃখ-দুর্দশা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। দেশের চাহিদা ও বহির্বাণিজ্যের চাহিদা অনুযায়ী এ সময় বাংলাদেশে আনুপাতিকভাবে খাদ্য-শস্য যেমন ধান, গম, যব, সরিষা, ইক্ষু প্রভৃতি এবং পণ্যশস্য যেমন কার্পাস, তুঁত, নীল, পাট প্রভৃতি উৎপাদন করত। খাদ্যশস্যের উৎপাদনে ইংরেজরা প্রত্যক্ষভাবে লাভ করত না। তাই তারা এই অনুপাতকে ভেঙ্গে দিয়ে নিজেদের স্বার্থমত কম শস্য উৎপাদনে কৃষকদের বাধ্য করত এবং ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত করে তাদের ওপর অমানুষিক পীড়ন করত। নীলকুঠির মালিক সাহেবদের অত্যাচার উনিশ শতকের মধ্যভাগে এতো বেশী হয় যে কৃষকেরা বিদ্রোহ না করে পারেনি। সে সময়ের বিশিষ্ট মনীষী রামমোহন রায় যদিও বলেন, "There may be some partial injury done by the indigo-planters ; but on the whole they have performed some good to the generality of the natives of the country than any other class of Europeans."[২৫]

রামমোহনের মত মনীষীর পক্ষে এরূপ ভ্রান্ত উক্তি সত্যই বিস্ময়কর। অনুমান করা যায় মহাজনী কারবারের ব্যাপারে তিনি নীলকর সাহেবদের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। রামমোহনের মন্তব্যের সমর্থন সেসময়ের কারও লেখায় পাওয়া যায় না, বরং নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের প্রমাণ পরবর্তীকালে নীল কমিশনের সামনে উপস্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে নীল অত্যাচারের কাহিনী ইংরেজীতে অনুবাদ করার জন্য মহাত্মা জেম্‌স্‌ লঙ্‌ সাহেব কারাবরণ করেছিলেন।

বিভিন্ন বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, উনিশ শতকে বাংলার কৃষির অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। সেই অবস্থার বর্ণনা করে বিভিন্ন বিবরণ বাংলার কৃষি ও কৃষকদের সম্বন্ধে নানা অপপ্রচার করে। কিন্তু বাংলার সুউন্নত কৃষি ব্যবস্থাকে ইংরেজ সরকার ও তার স্তাবক দেশীয় জমিদাররা পরিকল্পিতভাবে যে ধ্বংস করে তার মূল্যায়ন আধুনিক ইতিহাসে বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত। অনাবাদী জমির পরিমাণ এ সময় অনেক বেড়ে যায় এবং তার জন্য পরোক্ষ-ভাবে দায়ী করা হয় নিরীহ গরীব চাষীদের, অথচ যাঁরা এর জন্য প্রকৃত দায়ী তাঁরা অর্থাৎ জমিদাররা, তখন জমিদারীর অর্থে কলকাতায় বিলাসে ডুবে ছিলেন, তাঁদের কেউ দেশদ্রোহী বলে ধিক্কার দেয় না।

কৃষির মত শিল্পেও আঠারো শতকের বাংলা ছিল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধশালী দেশ এবং ইংরেজ সরকার ও তার দেশীয় স্তাবক সম্প্রদায়ের প্রধান কৃতিত্ব হল সেই শিল্পকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা এবং শিল্পপ্রযুক্তি বিদ্যায় উন্নত জাতকে ভিখিরী শ্রমিকে পরিণত করা। দেশীয় শিল্পের প্রতি উপেক্ষা আর অবজ্ঞা প্রচারে মুখ্য ভূমিকা নেয় কলকাতার ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়।

পলাশীর আগে বাংলায় তিনটি ধারায় শিল্পোৎপাদন হত এবং এই তিন ধারার সমন্বয়ে বাংলার শিল্পের বিকাশ ছিল প্রয়োজনানুযায়ী দ্রুত। প্রথম ধারায় শিল্পী নিজের মূলধনে ও নিজের দক্ষতায় স্বাধীনভাবে পণ্য উৎপাদন করত, এখানে তার প্রতিভা বিকাশের ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিষ্কণ্টক পথ। শিল্পীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শিল্পজাত দ্রব্যের উৎকর্ষতা সাধনে সহায়ক ছিল। দ্বিতীয় ধারাটি 'কুটির শিল্প' নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থায় শিল্পী বা কারিগর উৎপাদন সরবরাহকারী বণিকদের কাছ থেকে আগাম অনুদান নিয়ে একক বা সমষ্টিগতভাবে নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যাদি উৎপাদন করত ও বণিকদের সরবরাহ করত। এই ব্যবস্থায় উন্নত শিল্প প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ থাকলেও শিল্পীর স্বাধীনতা অনেকটা খর্ব হত। তৃতীয় ধারাটি ছিল পাশ্চাত্য দেশের মত। কোন উৎপাদক বা মালিক শিল্পী, কারিগর ও কর্মীদের দলবদ্ধ (factory) ভাবে কাজে লাগিয়ে শিল্পোৎপাদন করা। শিল্পে মালিক শ্রমিক সমবায়ের ছিল এটি আদি রূপ। এখানে কিন্তু শ্রমিক শোষণের চিন্তা ছিল অনুপস্থিত। তাই শ্রমিক অসন্তোষ এই শিল্পের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেনি।

এদেশে শিল্প ছিল পরিবারকেন্দ্রিক এবং বৃত্তি বা পেশা অনুযায়ী জাতিবিভাগ ছিল। স্বাভাবিক রীতি ছিল বংশানুযায়ী বৃত্তি বা পেশা গ্রহণ করা। গ্রাম সমাজের সুদৃঢ় অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরী হয়েছিল এরূপ স্থায়ী উপার্জন রীতি প্রচলিত থাকায়। শিল্প সংযুক্ত সামাজিক শ্রেণী ছিল তন্তুবায়, কর্মকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, চর্মকার, সূত্রধর, বাস্তুকার প্রভৃতি। বংশগত ধারায় শিল্পগুলি পরিচালিত হত বলে শিল্পের প্রগতি ছিল বাধাহীন ও প্রতিভা বিকাশের পথও ছিল সুগম। কিন্তু বৃত্তি নির্ধারণে স্বাধীনতা না থাকায় শিল্প নির্বাচন সীমিত পরিবেশে আবদ্ধ ছিল। দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের জায়গায় বিলিতী সামগ্রী চালাবার জন্য ইংরেজরা পরিকল্পিতভাবে দেশীয় জিনিষ মন্দ এবং বিলিতি জিনিষ ভালো এই প্রচার পলাশীর পর থেকেই সুরু করে এবং পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দেশীয় ইংরেজ স্তাবক ধনীদের হাত করে তাদের দিয়ে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। ফলে দেশীয় শিল্পের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়।

আঠারো শতকে সারা পৃথিবীতে খ্যাতি ছিল বাংলার বয়ন শিল্পের।

প্রধানতঃ বয়ন শিল্পজাত দ্রব্যের আকর্ষণে ইউরোপ ছুটে আসে বাংলাদেশে। ইউরোপের অর্থে এই শতকে বাংলার শিল্প সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। একে ধ্বংস করতে ইংরেজরা প্রথম থেকেই উঠেপড়ে লাগে। এই শিল্পের তিনটি ভাগ—(১) সূতী বস্ত্রশিল্প (২) রেশমী বস্ত্রশিল্প ও (৩) চটশিল্প। বস্ত্র-শিল্পের আবার দুটি শ্রেণী ছিল, একটি সূক্ষ্ম, অপরটি মোটা। এছাড়া ছিল রেশমী বস্ত্র, রুমাল, চটের কাপড়, গালিচা, শতরঞ্চি প্রভৃতি মিহি ও মোটা নানান ধরনের বয়ন প্রচলিত ছিল। বাংলার বয়ন শিল্পের বিকাশ ও প্রসার সে যুগে ছিল অভূতপূর্ব। পরিমাণ এতো বিপুল ছিল যে রাজা, বাদশা, জমিদার এবং জনসাধারণের সব চাহিদা মিটিয়েও বাংলার বস্ত্র ও বয়নজাত অন্যান্য দ্রব্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ও বহির্ভারতে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ক্রমবর্দ্ধমান। ১৭৫৩-৫৬-এর মধ্যে বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রপ্তানীর পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

	মোট রপ্তানী (টাকায়)	সূতীবস্ত্র (টাকায়)	রেশম (টাকায়)
১৭৫৪	২৫, ৯৫, ৩৫৬	২২, ৮৭, ১২৮	১, ৬৫, ৭৯২
১৭৫৫	৩২, ৯২, ০৪০	২৬, ৬০, ৫২০	৩, ৫৪, ৩৫২
১৭৫৬	২৬, ৪৭, ৫০৪	২১, ১৮, ০৪৮	২, ৬৭, ৪০০[২৬]

১৭৫৬ সালে ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের বিরোধ হওয়া সত্ত্বেও বাণিজ্য খুব বেশী হ্রাস পায়নি। ইংরেজরা এই সময় রপ্তানী বাণিজ্যে প্রধান অংশগ্রহণ করলেও পর্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার 'জার্মান প্রভৃতি দেশগুলিও বাংলার রপ্তানী বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করত। তাছাড়া বাংলার শিল্পজাত সামগ্রী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও বিপুল পরিমাণে রপ্তানী হত। বাংলার শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানীর বিপুল পরিমাণই জানিয়ে দেয় এই সময় বাংলা প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্পে কত উন্নত ছিল। বয়ন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল বাংলার বহু পরিবার এবং কৃষিজীবীদের সংখ্যার পরেই ছিল বয়ন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অধিবাসীর সংখ্যা। বিদেশী পর্যবেক্ষকরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেন, "বাংলার প্রতিটি গ্রামের পুরুষ, নারী ও শিশুরা বস্ত্র বয়নে নিযুক্ত থাকে।"[২৭] এদেশে ইংরেজদের অত্যাচার সুরু হবার পর পর্যবেক্ষকদের এই সব বিবরণ দেখা যায়। কোম্পানীর বণিকদের প্রতিভূ দেশীয় সরকার, মহাজন, দালাল প্রভৃতিদের দ্বারা গ্রাম্য শিল্পী ও প্রযুক্তিবিদরা নিগৃহীত ও প্রতারিত হতে থাকে। ব্যবসায়ীরা উন্নত মানের শিল্প দ্রব্যের জন্য উৎপাদকদের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করলেও নিজেরা পৃথিবীর বাজার থেকে মোটা টাকা লাভ করত। সে টাকার কোন অংশ উৎপাদন শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হত না। বস্ত্রশিল্পে বাংলা ছিল তখন পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পাওলো

মন্তব্য করেছেন, 'পৃথিবীর আর কোন দেশ বাংলার সমকক্ষ হতে বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারাতে পারবে না।"[২৮] সারা বাংলা জুড়ে নানা বিচিত্র ধরনের বস্ত্র তখন উৎপাদন হত এবং এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল বাংলার অগণিত অধিবাসী। এই শিল্প পরিবার-কেন্দ্রিক কুটির শিল্প হওয়ায় মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক তৈরী হবার কোন সুযোগ ছিল না। এই হস্তশিল্পের কর্মকুশলতা এতো বেশী ছিল যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যান্ত্রিক সুবিধা গ্রহণের প্রয়োজনও অনুভূত হয়নি। শিল্পী ও কর্মীরা বিত্তশালী না হলেও চাহিদা অনুযায়ী শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী হতে পারত। আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকেই পরিকল্পিতভাবেই বাংলার উন্নত মানের বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলে এবং ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে মুখ্য ভূমিকা নেয় বাংলার ধনী জমিদাররা। আর্থিক অনুদান বন্ধ করে দিয়ে একদিকে যেমন শিল্পটিকে পঙ্গু করার চেষ্টা হয়, তেমনি অপরদিকে বিলিতি বস্ত্র আমদানী সুরু করে বিত্তশালী দেশীয়দের প্রলুব্ধ করা হয়।

কার্পাসের মত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের উৎকৃষ্ট রেশম শিল্প বাংলার গৌরব বিশেষভাবে বৃদ্ধি করে। এদের মধ্যে ঢাকার রেশম শিল্প সারা পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট বলে বিখ্যাত ছিল। ঢাকার মসলিন অনায়াসে ইউরোপ জয় করে।[২৯] বস্ত্রের ওপর নানা রকম সূক্ষ্ম সূচের—এমব্রয়ডারী, সোনা রূপোর জরির শিল্প-সুষমার কাজ, বিভিন্ন ছাপার কাজ দেখে সারা ইউরোপ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। ঢাকা ছাড়া মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানও রেশম শিল্পের জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। বাংলার কার্পেট, শতরঞ্চি, গালিচা, মাদুর, শীতলপাটি প্রভৃতির বয়ন শিল্পও বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। বয়ন শিল্প ছাড়া অপর প্রধান শিল্প ছিল চিনি যা বিপুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হত। পলাশীর ঠিক আগের বছরে বাংলায় মোট চিনি উৎপাদন ছিল পাঁচ লক্ষ মন।[৩০] বিদেশী পর্যটকরা যেমন চিনি প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করেছেন তেমনি বর্ণনা করেছেন সোরা, লাক্ষা প্রভৃতিরও। লবণ উৎপাদন হত সুপ্রচুর পরিমাণে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও লবণ রপ্তানী হত। রেনেলের জার্নাল থেকে জানা যায় যে, বীরভূমের লোহার খনি থেকে লোহা তুলে কারখানায় ব্যবহারযোগ্য লোহা পরিণত করা হত এবং তা থেকে প্রযুক্তিবিদ বিজ্ঞানীরা নানা প্রয়োজনীয় জিনিষ ছাড়া অস্ত্রশস্ত্রাদিও নির্মাণ করত। আঠারো শতকে এদেশের প্রযুক্তিবিদরা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক উন্নত ছিলেন। দেশীয় প্রথায় তৈরী কাগজ শিল্পও অনুন্নত ছিল না এবং বাংলার বাইরে কাগজও রপ্তানী হত। সূক্ষ্ম হস্তশিল্পের কাজে—বিশেষ করে সোনা, রূপা ও অন্যান্য ধাতুর এবং হাতীর দাঁত, শঙ্খ প্রভৃতির শিল্পও শিল্পোন্নত দেশের পরিচয়

বহন করত। খোদাই ও ধাতু অলঙ্করণ শিল্পও জনপ্রিয় ছিল। চামড়া, মাটি, কাঠ, বাঁশ প্রভৃতি দিয়েও প্রস্তুত হত নানা প্রয়োজনীয় ও সৌখীন সামগ্রী। নৌকা, বজরা, সমুদ্র জলযান এবং গরুর গাড়ী, পাল্কী প্রভৃতি স্থলযান প্রস্তুতেও বাংলা পিছিয়ে ছিল না। বাঙ্গালী শিল্পী ও প্রযুক্তিবিদরা যেরকম উন্নত ধরনের সৃজনপ্রতিভার পরিচয় দেন তা যে কোন দেশের পক্ষেই গৌরবজনক। উন্নত কৃষি ও শিল্প বাংলার আর্থিক কাঠামোকে এমন সুদৃঢ় করে রাখে যে কোন কিছুর জন্যই বিদেশের ওপর নির্ভর করতে হয়নি।

পলাশীর পরের প্রথম অর্ধশত বছরে ইংরেজ বণিকরা সুপরিকল্পিতভাবে বাংলার কৃষি ও শিল্পকে ধ্বংস করতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে এদেশের কৃষিজীবী, শিল্পী, প্রযুক্তিবিদদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করতে থাকে। এই অপপ্রচারে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন কিছু বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও ধনী ইংরেজ স্তাবকরা। এঁদের ওপর নির্ভর করে আজও অনেক বুদ্ধিজীবী ইংরেজ সরকারের বিবরণ বিনা যাচাইএ অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করেন এবং নিজের দেশের গৌরবময় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেন। বাংলার সৃজন প্রতিভার ধ্বংসের ওপরই রচিত হয়েছে উনিশ শতকের (নবজাগরণের ?) ইতিহাস।

বাংলার প্রাক্-পলাশী আর্থ-সামাজিক কাঠামো ছিল পিরামিডাকৃতি।[৩১] এর চূড়ায় থাকে রাজা বা জমিদার এবং সবচেয়ে নীচুতে থাকে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ। রাজা বা জমিদারের পরেই থাকে প্রভাবশালী অভিজাত সম্প্রদায়। এঁরা হলেন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও প্রশাসন সহায়ক। এর পরেই থাকে সম্পন্ন ভূস্বামী, বণিক, মহাজন, সরকার, করণিক শ্রেণীর কর্মচারী, গোমস্তা, মুৎসুদ্দি প্রভৃতি এবং শেষ স্তরে বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠী যাদের মধ্যে থাকে কৃষিজীবী, বিভিন্ন বৃত্তিধারী হস্তশিল্পী ও শ্রমজীবী। এই স্তর-ভেদের প্রধান নির্দেশক আর্থিক অবস্থার তারতম্য। বাংলার সমাজ প্রশাসিত হত ধর্মীয় অনুশাসনভিত্তিক জাতি ও বর্ণভেদের দ্বারা। ভারতীয় সমাজের বর্ণকে অনেক সমাজবিজ্ঞানী মার্কসীয় শ্রেণীর মত মনে করেন।[৩২] পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচ্য সমাজের এই বিচার সঠিক মূল্যায়নে সাহায্য করে না! ধর্মীয় অনুশাসনই ভারতীয় সমাজের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করেছে। এই অনুশাসনের পরিচালক ও সংরক্ষক ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা যাঁরা ছিলেন বৈষয়িক বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লোভ এবং ভোগবিলাসের জীবন থেকে মুক্ত। সমাজে তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে শ্রদ্ধেয়। আর্থিক মানদণ্ড দিয়ে সমাজে তাঁদের স্থান নির্দেশিত হয়নি। সমাজের সর্বস্তরকে নিজ নিজ আর্থিক অবস্থায় তৃপ্ত থাকতে দরিদ্র ব্রাহ্মণরাই অনুপ্রাণিত করত। ফলে সমাজে অসন্তোষ খুব ছিল না। আর্থিক অবস্থা নিরপেক্ষ সামাজিক স্তরবিন্যাস

থাকায় সমাজের প্রতি স্তরেরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা ছিল এবং প্রত্যেক বৃত্তিধারীই নিজ নিজ কর্তব্যকে সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করত। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় কষ্টভোগ, আত্মপীড়ন, আত্মহনন প্রভৃতির নানা অমানবিক প্রথা সচ্ছন্দে সমাজে অনুপ্রবেশ করে। এবং রাষ্ট্র প্রশাসনের দুর্বলতা বা অস্থিরতার সুযোগে অশুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা অনুশাসনের নানা কুসংস্কার সমাজের ওপর চাপিয়ে দেয়। পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে আসার আগে দেশীয় সমাজের কাঠামো যেমন সুদৃঢ় ছিল, তেমনি কোন প্রথা বা রীতির বলপ্রয়োগও বিশেষ ছিল না। নবাবী আমল পর্যন্ত তাই সমাজের সুসমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপই দেখা যায়।

পাশ্চাত্য ভাবধারা ও শিক্ষা এদেশে আসার পরই দেশীয় সবকিছুকেই ঘৃণা আর উপেক্ষা করতে শেখায়। এদেশের সব খারাপ আর ওদেশের সব ভালো। জাতিবিরোধ, শ্রেণীবিরোধ, সম্প্রদায় বিরোধও প্রকট রূপ নিতে থাকে তারপর থেকে। পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানীরা দেশীয় সমাজের যে দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করেছেন তা ইংরেজদের সংস্পর্শে আসার পরই হয়েছে।

সমাজের স্তর নির্ণীত হয়েছে বৃত্তি বা পেশা দ্বারা এবং গ্রামের অঞ্চলও সুনির্দিষ্ট হয়েছে সেইভাবে। সব গ্রামেই তাই দেখা যায় কুমোরপাড়া, তাঁতীপাড়া, কামারপাড়া, কলুপাড়া, সদগোপপাড়া, তেলীপাড়া, বারুইপাড়া, বামুনপাড়া, সরকারপাড়া প্রভৃতি। কমবেশী হলেও সমাজে সব পেশারই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা ছিল এবং জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বৃত্তির অধিকারীরা নৈপুণ্য ও পরিশ্রমের যথোচিত মর্যাদা পেত। ইংরেজরাই এদেশের তথাকথিত শিক্ষিতদের শেখায় এই বৃত্তিধারী মানুষকে হেয় করতে এবং এদের ঘৃণাই এদেশের শ্রেণীবিভেদকে প্রকট করে তোলে। বৃত্তিনির্ভর সমাজের শ্রেণী-বিন্যাস এদেশের আর্থিক ভারসাম্য অনেকটা বজায় রাখে। সমাজতাত্ত্বিক নির্মল বোসের মতে, "এরকম বৃত্তিমূলক বর্ণ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল সমাজে প্রতিযোগিতাহীন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।[৩৩] গ্রাম সমাজের আর্থিক নিরাপত্তা এর দ্বারা অনেকখানি সুরক্ষিত হয়। সমাজের অভ্যন্তর থেকে তাই কোন অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়নি। যদিও এই ব্যবস্থায় সমাজের অন্তর্মুখিতা বেড়ে যায় এবং কমে যায় বহির্বাংলা সম্পর্কে আগ্রহ। বাইরে থেকে আঘাত এলে বৃত্তিধারীরা ঠিকমত মোকাবিলা করতে পারেনি।

আঠারো শতকে বাংলার মুসলমান সমাজের গঠন ও প্রকৃতি হিন্দু সমাজের চেয়ে অনেকটা আলাদা ছিল। তাদের সামাজিক স্তর সংখ্যা ছিল অনেক কম এবং এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যাওয়ার কোন বাধা ছিল না। সামাজিক বিধিনিষেধের কড়াকড়ি অনেক কম ছিল। ১৮ শতকের বাংলার জনগোষ্ঠীর শতকরা ৮০ ভাগের মত ছিল কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী। আর মুসলমান

জনগোষ্ঠীর শতকরা ৬২ ভাগ ছিল কৃষি ও শ্রমজীবী।[৩৪] কৃষকদের মধ্যে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না সরল জীবনযাপনের অসচ্ছলতা। একজন সমাজবিজ্ঞানী পরবর্তীকালে দেখেছেন এদের মধ্যে জীবনধারণের মানোন্নয়নে আন্তরিক প্রচেষ্টার অভাব এবং পারস্পরিক ঝগড়াবিবাদের প্রাবল্য।[৩৫] এঁর পর্যবেক্ষণ সঠিক নয়, নির্ভরযোগ্য আর্থিক কাঠামোকে এরা ভাঙ্গতে চায়নি এবং পারিবারিক বিবাদ সমাজের সমগ্র চিত্র উদ্ঘাটিত করে না। গ্রাম্য সমাজে পারস্পরিক বিরোধের প্রাবল্য দেখা যায় ইংরেজদের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই।

বাংলায় হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পলাশীর আগে ও পরে কিরূপ সম্পর্ক ছিল তা অনুধাবন করা অপ্রাসঙ্গিক নয়। এ সম্বন্ধে সোজাসুজি মন্তব্য করা যায় না। কারণ পলাশীর আগে বেশ কিছুদিন রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা যায় এবং সেই সুযোগে কিছু অশুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বাংলার কোন কোন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু এর প্রভাব অধিকাংশ গরীব জনসাধারণের ওপর স্থায়ী ছাপ ফেলতে পারেনি। রাজনৈতিক নেতাদের উস্কানিতে মাঝে মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও হিন্দু-মুসলমান গরীব কৃষকদের মধ্যে সৌহার্দে চিড় খাওয়াতে পারেনি। গোলাম হোসেন মন্তব্য করেছেন, "তারা (হিন্দুরা) এমন ধর্ম, শাস্ত্র ও রীতিনীতি পালন করে যে তাদের চোখে মুসলমান বিদেশী ও অপবিত্র, তবু কালের যাত্রার পথে একে অপরকে কাছে টানলো, যে মুহূর্তে ভয় পরিহার করার মনোভাব কেটে গেল আমরা দেখলাম বৈসাদৃশ্য ও বিচ্ছিন্নতা শেষ হল বন্ধুত্ব ও ঐক্যে। দুটি জাতি একটি জাতিতে পরিণত হল।"[৩৬] পলাশীর পর থেকে ইংরেজ কোম্পানী নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যায় এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাবের অবসান ঘটাতে।

পলাশীর আগে থেকেই বাংলার জনসাধারণের ওপর ধর্ম ও লোকাচারের অনুশাসনের প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশী। ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের সময় এই অনুশাসন উৎপীড়নের রূপ নেয়। ধর্ম ছিল সমাজের গতি-প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণকর্তা। সাধারণ মানুষের জাতিয়তাবোধ ছিল ধর্মকেন্দ্রিক, রাষ্ট্রনৈতিক সচেতনতা ছিল অনুপস্থিত। চতুর ইংরেজ তাই নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিকতাকে সাবধানে এড়িয়ে গেছে। ধর্ম-নিরপেক্ষতার ভান করে ইংরেজরা এদেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভিত তৈরী করে। তবে উনিশ শতকের শেষার্ধে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের যে আন্দোলনের সূচনা হয় তার পটভূমি রচিত হয় এই যুগে। পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে আসার আগেই হিন্দুদের শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মমতগুলি একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এর প্রভাবে বাংলার প্রাণধর্মে শাস্ত্রগত-

সংস্কার থেকে মুক্তি, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান, প্রচলিত অকল্যাণকর মতবাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রভৃতি লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরই প্রতিফলন দেখা যায় রামরাম বসুর রচনায়। তিনি ১৮০২ সালে লিপিমালায় লিখেছেন, "শুন মানুষ একবীজ হইতে উদ্ভব ইহাতে সকলে ভাই ভাই। যদি ভ্রাতৃগণের মধ্যে কাহারও দুঃখ কি সুখ হয় তাহাতে অন্য ভ্রাতৃদিগের হর্ষ কি বিমর্ষ।"[৩৭] পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু প্রমুখ উদার মতাবলম্বী মনীষীরা বাংলার চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে নতুন চিন্তার বীজ বপন করেন। ধর্ম ও সমাজ ত্যাগ করে নয়, সমাজের অভ্যন্তরে থেকেই উদার মানবতাবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন, তাই তাঁদের কথা বাংলার মানুষের মনে পৌঁছিতে পারে। এই সময় আউল, বাউল, কর্তাভজা, সাহেবধনী, বলাহাড়ী প্রভৃতি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী উপাসক সম্প্রদায়গুলিও বাংলার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র কৃষি ও শ্রমজীবীদের মধ্যে কুসংস্কারশূন্য উদার মানবতাবাদী ধর্মমত প্রচার করে। এদের প্রভাবও পরবর্তীকালের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ওপর কম পড়েনি। হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য ও প্রসার বাংলায় অব্যাহত থাকে এবং বাংলায় উদার সুখী সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। এই সম্প্রদায়ের ঔদার্য ও ভক্তিবাদ সহজেই হিন্দু প্রতিবেশীদের কাছে টেনে আনে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে ওঠে সৌভ্রাতৃত্ব।

এ যুগের বাঙ্গালীদের সম্পর্কে বিদেশী পর্যটকরা নানারকম উক্তি করেছেন। এদের কিছু উক্তি বাঙ্গালীকে হেয় করার জন্য এবং বাংলার কোম্পানীর অত্যাচারের কদর্যতা ঢাকার জন্য। যেমন ওরমে বলেছেন, "বাঙ্গালীরা দেহে খাটো, মানসিক ও শারীরিক শক্তি কম। বাঙ্গালীর সাহস ও সহ্য করার ক্ষমতা নেই বললেই চলে।"[৩৮] আঠারো শতক পর্যন্ত যে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশ বলে বিবেচিত ছিল তার অধিবাসীদের কম শক্তিসম্পন্ন বলা যে উদ্দেশ্যমূলক তা সহজেই বোঝা যায়। বাংলা ও বাঙ্গালীদের সম্পর্কে এইরূপ বিকৃত মন্তব্যের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা আমাদের ইতিহাসবিদরা খুবই অল্প করেন। আবার সে যুগের বাঙ্গালীর সম্বন্ধে ভালো মন্তব্য, যেমন ১৭৯৩ সালে উইলিয়ম কেরী বলেন, "I see one of the finest countries in the world full of industrious inhabitants."[৩৯]

একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, পলাশীর পরে বাংলার রূপান্তরের প্রকৃত চিত্র আজও অপ্রস্ফুটিত এবং আঠারো ও উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য নয়। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় অত্যাচারী ইংরেজ কোম্পানী সরকারের কর্মচারীদের প্রদত্ত বিবরণাদির সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা আমাদের ইতিহাস চর্চায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

উল্লেখপঞ্জী

১. Mazumdar, R. C : History of Freedom Movement of India. Part I, p. 283

২. Dharampal : Science and Technology in 18th Century India

৩. গুপ্ত, অজিত : 'কলকাতা', ১৩৭৩ সংখ্যা

৪. Loch, Donald : Illustrated weekly of India. Nov. 8, 1983

৫. Alverage, C : Ibid

৬. ১৯৭৯ সালের হ্যালেহেডের ব্যাকরণের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশের সভায় (এশিয়াটিক সোসাইটি) উল্লিখিত।

৭. মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার : প্রাক্ পলাশী বাংলা। পৃঃ ৫

৮. ঐ ঐ পৃঃ ৫৯

৯. সরকার, যদুনাথ : History of Bengal. Vol. II, p. 153

১০. রায়, নিখিলরঞ্জন : 'অন্ধকূপ হত্যা'। ঐতিহাসিক চিত্র, ৪র্থ পর্যায়, ৮ম সংখ্যা, ১৩১৫, পৃঃ ৩৪৬

১১. Orme, Robert : Historical Fragments of Mughal Empire. p. 404

১২. Marshall, Peter : Bengal the British Bridgehead 1780-1828. p. 7-8

১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন : সেকালের দুর্গোৎসবের ফর্দ। ঐতিহাসিক চিত্র, ১৩১৫, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৭৮-৭৯

১৪. মুখোপাধ্যায়, সুবোধ : প্রাক্ পলাশী বাংলা। পৃঃ ৩৯

১৫. ঐ ঐ পৃঃ ৩৯

১৬. ঐ ঐ পৃঃ ৩৯

১৭. ভট্টাচার্য, রামেশ্বর : শিবায়ন। পৃঃ ৪৪-৪৫

১৮. Sarkar, J. N. : The war in India. p. 5-6

১৯. চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার : বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজন। পৃঃ ৫৯

২০. Shore, Sir John : Minutes 1759. pp. 1812, VII, p. 184

২১. Marshall, Peter : Bengal the British Bridgehead. p. 46

২২. Colebrooke, H. T. : Selection of papers. I, p. 201

২৩. Chowdhury, B. B. : Agricultural growth in Bengal and Bihar in Bengal Past and Present. XCV (1976), p. 324

২৪. Baily, W : Statistical view of population of Burdwan in Asiatic Researches. XII (1816), p. 511
২৫. Nag and Burman : English writings of Rammohan. IV, p. 83
২৬. মুখোপাধ্যায়, সুবোধ : প্রাক্ পলাশী বাংলা। পৃঃ ৬২-৬৪
২৭. Orme, Robert : History of military transaction...Vol. II, p. 4
২৮. Pattulo : On Improving and Cultivating Bengal. p. 25
২৯. Renell : Memoirs of Hindusthan. p. 61
৩০. মুখোপাধ্যায়, সুবোধ : প্রাক্ পলাশী বাংলা। পৃঃ ৪১
৩১. বসু, নিমাইসাধন : মুঘল আমলে বাংলার জমিদার। পৃঃ ৩৭
৩২. Bose, N. K : Culture and Society in India. p. 239
৩৩. ,, : Socio-economic change in India. p. 8
৩৪. মুখোপাধ্যায়, সুবোধ : প্রাক্ পলাশী বাংলা। পৃঃ ২২
৩৫. Hunter : Annals of Rural Bengal. Vol. I, p. 158
৩৬. মুখোপাধ্যায়, সুবোধ : প্রাক্ পলাশী বাংলা। পৃঃ ২৯
৩৭. চট্টোপাধ্যায়, সুনীল : মুনশী রামরাম বসু। পৃঃ ৪৬
৩৮. Orme, Robert : Historical fragments of Social affairs. Vol. II, p. 4-5
৩৯. Smith, George : William Carey. p. 89

আঠারো শতকের বাংলা গদ্য

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব সম্বন্ধে বিতর্ক দীর্ঘকালের, কিন্তু মীমাংসার উপযোগী অনুসন্ধান হয়েছে একথা বোধ হয় বলা যায় না। পণ্ডিত-গবেষকেরা অনুসন্ধান করেছেন এবং এখনও করছেন। অনেকের সুদৃঢ় অভিমত, রাজা রামমোহন রায়ই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রকৃত স্রষ্টা। রামমোহনের পূর্ববর্তী যুগে সাহিত্য-পদবাচ্য কোন গদ্য সৃষ্টি হয়নি।[১] এই অভিমত প্রতিষ্ঠা করার জন্য শুধু কেরী অথবা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের রচনাকে উপেক্ষা করা হয়েছে তা নয়, উপরন্তু তার আগের গদ্যের অস্তিত্বের কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আঠারো শতক চিহ্নিত হয়েছে বন্ধ্যাকাল বলে। কিন্তু তথ্য-প্রমাণের দ্বারা বিষয়টি কি সুপ্রতিষ্ঠিত? প্রাপ্ত উপাদানের অপ্রতুলতার যথার্থ কারণ কি অনুসন্ধানযোগ্য নয়? বিষয়টি নিয়ে কি চিন্তা করা যায় না? এই প্রশ্নগুলির উত্তর সন্ধানের সূত্রপাত করা প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাংলা গদ্যের ব্যবহার ঠিক কবে শুরু হয়েছে তা জানা যায় না। গদ্যের প্রসারের গতি নির্ণয়ের উপযোগী উপাদানের একান্ত অভাব। কিন্তু তথ্য-উপাদানের অনুসন্ধান সম্পূর্ণ না করেই বলা যায় না, 'যেকোন কারণেই হউক, আধুনিক যুগের পূর্বে বাংলা গদ্যের উদ্ভব হয়নি।'[২] যতদূর জানা যায় সংস্কৃত, প্রাকৃত ও মাগধী হতে বাংলা মৌখিক ভাষারূপে ব্যবহৃত হতে শুরু হয় নবম শতাব্দী থেকে এবং ভাষাটি পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করে ত্রয়োদশ শতকে।[৩] তেরো হতে আঠারো শতক এই পাঁচশো বছর বাংলা গদ্য-সাহিত্যের অনুপস্থিতি বিশ্বাস করতে হলে যে প্রমাণের প্রয়োজন তা পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে সেই জন্মকাল থেকে এখনও পর্যন্ত মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য বাংলা ভাষাকে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মুখের ভাষা লিখে গেলেই সহজ গদ্য হয়, কিন্তু এই লেখার জন্য দরকার ব্যাপক ব্যবহারের সুযোগ আর উন্নতির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রসারের বাধাহীন ক্ষেত্র। বাংলার ভাগ্যে তা কোন দিনই জোটেনি। প্রাচীনকালে সংস্কৃত, মুসলমান যুগে ফার্সী আর ইংরেজ শাসন ও তার পরে (পশ্চিমবঙ্গে) ইংরেজী বাংলাকে সরকারি কাজে ব্যবহৃত হবার সুযোগ হতে বঞ্চিত করেছে। এই সুযোগ না থাকায় বিত্তশালী জমিদারেরা বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য কখনও এগিয়ে আসেনি। শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বাংলার লাভ হয়েছে গোঁড়াপন্থীদের উপেক্ষা। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের আগে দেশীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে বাংলার কোন মর্যাদা ছিল না।

অবহেলা আর তুচ্ছতার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়েছে, সরকার ও বিত্তশালীদের সমাদর ছাড়াই। ইংরেজ রাজকর্মচারী ও মিশনারীরা পথ না দেখালে অভিজাত সমাজে বাংলা-সাহিত্যের উত্তরণ হতে হয়তো আরও অনেক সময় লেগে যেত। প্রকৃতপক্ষে এঁরাই অভিজাত সমাজকে শেখান বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দিতে এবং এঁদের অনুসরণ করেই উচ্চবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা বাংলা সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে আসেন।

বাংলার গদ্যরূপ প্রথম হতে একেবারে অনুপস্থিত ছিল, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।[৪] অবশ্য একথাও সত্য যে, ১৫৫৫ সালের আগের কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। উনিশ শতকের আগে সাহিত্যে ছন্দবিহীন রচনার সমাদর ছিল কম, তাই গদ্য-রচনার অনুপ্রেরণাও ছিল সীমিত। মৌখিক ভাষার মধ্যে অসংস্কৃত ও বিদেশী শব্দ স্বাভাবিকভাবেই মিশে গিয়েছিল। এই অনুপ্রবেশে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা বাধা দেন এবং ভাষার এক আড়ষ্ট রূপ দেবার চেষ্টা করেন। সাধারণ মানুষের কাছে তা সুখকর হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও উনিশ শতকের অনেক আগেই বাংলা গদ্য একটা সুস্পষ্ট রূপ পেয়ে যায় এবং তার সাহিত্যে উত্তরণ হয় স্বাভাবিকভাবেই, কারণ বাংলার অগণিত মানুষের সাহিত্যপিপাসা ছিল অকৃত্রিম ও গভীর। এদের দরদ ও মমত্ববোধের মধ্যেই গদ্য সাহিত্য অনুপ্রেরণা পায়। বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতিও লিখিত হত গদ্যে এবং তাও সংস্কৃত না-জানা লোকেদের সুবিধার জন্য। স্বাভাবিকভাবেই কথকতা, পুরাণ ও ভাগবত-পাঠ, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতির উপযোগী গদ্য-সাহিত্য পদ্যের পাশাপাশিই সৃষ্টি হয়েছিল। বেশীর ভাগ নিদর্শন অবহেলায় বিনষ্ট হয়েছে। নানা তথ্যের সন্ধান জেনেই সাহিত্য-গবেষক শিবরতন মিত্র লিখেছেন, "There existed considerable amount of Bengali prose writing long before the Serampore Missionaries or the Pundits of Fort William College."[৫]

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বাংলা ভাষা প্রথম পায় বৌদ্ধ পাল-রাজাদের সময়।[৬] বৌদ্ধরা ধর্মপ্রচারে মৌখিক ভাষাকে কাজে লাগাতেন বলে বাংলা গদ্যরূপ সংগঠিত হবার কিছুটা সুযোগ পায়। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে চর্যাগীতির সময় কবিরা ব্যবহার করেন লৌকিক ভাষা, যা গদ্যের অনেকটা কাছাকাছি আসে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সময় মুখের ভাষা সাহিত্যের আসরে অনেকটা সমাদর হারায়, তবে সংস্কৃতের প্রভাবে ভাষার উপাদানগত ও শাব্দিক পরিবর্তন হয়। এরপর ঘটে বাংলায় আরবী ফার্সী শব্দের অবাধ অনুপ্রবেশ, পরে ঢোকে পর্তুগীজ প্রভৃতি বিদেশী শব্দ। অসাহিত্যিক দৈনন্দিন কাজে, মামলা-মকদ্দমায়, জমিদারী কাগজপত্রে, ইস্তাহারে, চিঠিপত্রে বিদেশী শব্দযুক্ত

বাংলা গদ্যের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে বাড়ে।

আঠারো শতকে এসে বাংলা গদ্য পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শ পায়। পর্তুগীজ পাদ্রীরা ধর্মপ্রচারের জন্য নিজেদের উপযোগী গদ্য-গঠনে উদ্যোগী হন। এঁরা সে সময়ে প্রচলিত গদ্যের সাহায্য নেননি। এঁদের ভাষার আড়ষ্টতা বাংলা গদ্যের একটা কৃত্রিম রূপ দেয় যা বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণীয় হয়নি। উত্তরবঙ্গ তখন সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল, তাই অনুমান করা যায়, সেখানে সে সময় সহজ গদ্য প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকের দুইজন বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামরাম বসু এখান থেকে গদ্য রচনার অনুপ্রেরণা পান, এরকম অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। আঠারো শতকের শেষার্ধের প্রথমদিকে পর্তুগীজদের সাধুভাষায় আড়ষ্ট বাংলা লেখার ব্যর্থ প্রয়াস, বৈষ্ণবদের কড়চার ও দলিল-দস্তাবেজের দুর্বোধ্য ভাষা, সংস্কৃত ও ফার্সী পণ্ডিতদের বাংলার প্রতি অবজ্ঞা প্রভৃতির জন্য বাংলা গদ্যে অসংলগ্ন অবস্থা দেখা দেয়। ঠিক এই সময়েই ইংরেজ রাজকর্মচারীরা বাংলা ভাষার প্রতি মনোযোগ দেন। ফলে, নানা যুক্তিতর্কের সূচনা হয়, যার প্রতিক্রিয়ায় বাংলা ভাষায় আসে গতিশীলতা। কিন্তু আঠারো শতকের শেষ তিন দশকে বাংলাদেশের অবস্থা যখন সবদিক দিয়েই পর্যুদস্ত তখন এই গতিশীলতা কোন কাজে লাগে না। এই সময় বাংলার সমস্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলি ছিল অনাদরে বিপর্যয়ের মুখে। দরিদ্র বুদ্ধিজীবীদের অবস্থাও বিশেষ সংকটজনক। বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ নিয়ে সামাজিক সংকীর্ণতা মাথা তুলে সমাজকে পঙ্গু করে দেবার চেষ্টা করছে। শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এরই প্রতিফলন আমাদের বিশেষ করে নজরে পড়েছে; আর আঠারো শতককে আমরা বন্ধ্যা শতক বলে মনে করেছি। এই আপাত বন্ধ্যাত্বের কারণ অনুসন্ধানে আমাদের অনীহা সত্যই বিস্ময়কর।

চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ও কড়চা জাতীয় রচনায় বাংলা গদ্য যে সাবলীল-ভাবে প্রচারিত তাতে সহজে অনুমান করা যায়, সে সময় সংগঠিত গদ্য-সাহিত্য অপ্রচলিত ছিল না। বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে বাধা দেবার মত পরিবেশ ছিল না, বরং কথকতা, পাঠ, ধর্মালোচনা প্রভৃতির জন্য গদ্য-সাহিত্য সাধারণ মানুষের কাছে সুপরিচিত ছিল। যথোপযুক্ত নিদর্শন হয়তো নেই, কিন্তু পরবর্তীকালের উৎকর্ষ রচনার পটভূমি যে সে-সময়েই গঠিত হয়, এরূপ অনুমান ভুল নয়। কারণ, নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসন্ধান করলে নিদর্শন পাওয়া যাবে না, একথাও হলফ করে বলা যাচ্ছে না। যেমন বৃটিশ মিউজিয়মে হঠাৎ প্রাপ্ত গল্পাংশটি অনেকেরই বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। গল্পাংশের কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি, "এক দেশে এক সওদাগর ছিল। সে বাণিজ্যেতে গিয়াছিল। পরে তাহার জাহাজ ও নৌকা সকল ডুবিয়া যাইল।"[৭] এরকম

ঝরঝরে ভাষা যখন ছিল তখন গদ্য-সাহিত্য ছিল না, একথা ভাবা যায় না।

কোম্পানী সরকার প্রধানত রাজনৈতিক কারণে বাংলার পৃষ্ঠপোষকতা করে। পূর্ববর্তী শাসকদের সরকারি ভাষা ফার্সীর একাধিপত্য দূর করে প্রশাসনে মুসলমান প্রভাব কমানোর জন্যই কোম্পানী সরকারি কাজে বাংলা চালু করে। উপেক্ষিত বাংলা ভাষা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুতগতিতে উন্নতি করতে থাকে। ১৭৭৭ সাল হতে কলকাতায় মুদ্রণ প্রচলিত হবার পর বাংলা আর অপাংক্তেয় থাকে না। ১৭৭৭ সাল থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রণের নিম্নরূপ চিত্রটি পাওয়া যায়।[৮]

ভাষা	পুস্তক সংখ্যা
ইংরেজী	২২৮
ফার্সী	৬৯
বাংলা	৩১
আরবি	১৬
হিন্দুস্থানী	১৩
অন্যান্য	১১ (৩৬৮)

৩১টি বাংলা বই-এর বেশীর ভাগই গদ্যে লেখা সরকারি আইন ও নিয়মাবলী। এগুলি ইংরেজী অথবা ফার্সী রচনার বাংলা অনুবাদ। সরকারি নিয়মাবলী বলেই গ্রন্থগুলি ইংরেজ রাজকর্মচারীর নামে প্রচারিত, কারণ তা না হলে আইন-প্রয়োগের অসুবিধা দেখা দিত। ১৭৭৭ হতে ১৭৯৯-এর মধ্যে কলকাতায় মুদ্রিত বাংলা-গ্রন্থের তালিকাটি এখানে প্রদত্ত হল :[৯]

প্রকাশ-সাল	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	পৃষ্ঠা	বিষয়	মুদ্রক
১. ১৭৮৪	'মফঃস্বল দেওয়ানী' আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালতের বিচার ও ইনসায় চলন হইবার কারণধারা ও নিয়ম	জনাথান ডানকান	১৪২	সরকারি বিধি	কোম্পানী প্রেস
২. ১৭৮৪	সন ১৭৮১ সালের ৫ পাঞ্চি মাহে জুলাইতে শ্রীযুত	জনাথান ডানকান	৮২	সরকারি বিধি	ঐ

গভর্ণর জেনারেল
সাহেব ও শ্রীযুত
কৌন্সলী সাহেবের
হুকুম নামা যে
দিয়াছেন তাহার
খোলসা

৩. ১৭৮৫	Summary of the clauses of the Parliament	ঐ	১৪	ঐ	ঐ
৪. ১৭৮৫	Regulations for the administration of justice in the Courts of Dewani Adawlat passed in Council, 5th July, 1783 with a Bengali translation	ঐ	২৪৬	ঐ	ঐ
৫. ১৭৮৬	Asiatick Miscellany : contains Braj Bhasa couplets by Tulsidas and Beharylal printed in Bengali Character	—	—	সাময়িক পত্র	উইলিয়াম ম্যাককে
৬. ১৭৮৭	সন ১৭৮৭ ইংরাজী তারিখে ৮ই জুন প্রবল প্রতাপ শ্রীযুত গভর্ণর জেনারেল সাহেব কৌঁসলী বিষয় মালগুজারীসকল কর্ম্মের বিষয় দফাওয়ারি হুকুম করিলেন একারণ যেই দফা জমীদার ও ইজারাদারদিগের	জি. সি. মেয়ার	২৪	সরকারি বিধি	কোম্পানী প্রেস

এবং যে সকল জিলাদার
সাহেবানেরা তাবক্ষে
ইহারদিগের এলাকারকে
তাহাকোশসা নিকালিয়া
যাইলে লেখা যাইতেছে

৭. ১৭৮৭	Bengal translation of regulations, for the administration of justice in the Fowzdary or criminal courts	ঐ	২৪	ঐ	ঐ
৮. ১৭৮৭	Bengal translation of Regulations, ১২ই এপ্রিল, ১৭৮৭	ঐ	৮৪	ঐ	ঐ
৯. ১৭৮৭	Bengal translation of regulation for weavers, 27th June. 1787	ঐ	১৩	ঐ	ঐ
১০. ১৭৮৮	Asiatic Miscellany II	—	—	সাঃ পত্র	ম্যাককে
১১. ১৭৮৮	Asiatic Miscellany III	—	—	ঐ	ঐ
১২. ১৭৮৮	Treaty of Commerce, Parallel English, Persian and Bengali Texts in three columns	জে. এফ্ চেরী	১৮	সরকারি বিধি	কোম্পানী প্রেস
১৩. ১৭৮৮	Asiatic Researches Vol. I includes printing in Bengali Character	—	—	সাঃ পত্র	ঐ
১৪. ১৭৮৯	Additional supplement to the regulations for weavers, English, Persian and Bengali texts	জি. সি. মেয়ার	৫	সরকারি বিধি	কোম্পানী প্রেস

		are numbered consequently				
১৫.	১৭৯০	A comprehensive system of Bengal revenue includes Bengali numerals	ফ্রান্সিস গ্লাডুইন	—	গণিত	মানুএল ক্যাণ্টোভা
১৬.	১৭৯১	Bengal translations of regulations	এডমনস্টোন	৩৮	সরকারি বিধি	কোম্পানী প্রেস
১৭.	১৭৯২	ঋতুসংহার (বাংলা হরফে সংস্কৃত)	কালিদাস	৬৪	কবিতা	ঐ
১৮.	১৭৯২	Bengal translation of regulations for the guidance of the magistrates	এডমনস্টোন	২৬	সরকারি বিধি	ঐ
১৯.	১৭৯২	Asiatick Researches Vol. III	আপজন	—	সাঃ পত্র	ঐ
২০.	১৭৯৩	ইংরাজী ও বাংলা ভোকাবুলারী	ঐ	৪৪৮	শব্দকোষ	ক্রনিকল প্রেস
২১.	১৭৯৩	Bengal translations of the regulations	ফস্টারস্	১১৭৪	সরকারি বিধি	কোম্পানী প্রেস
২২.	১৭৯৪	ঐ	ঐ	—	ঐ	ঐ
২৩.	১৭৯৫	ঐ	ঐ	৫৮২	ঐ	ঐ
২৪.	১৭৯৬	A compendius system of Bengal Accounts 2nd edn.	গ্লাডুইন	২২৮	ঐ	ঐ
২৫.	১৭৯৬	Bengal translations of regulations	ফস্টারস্	৮০	ঐ	ঐ
২৬.	১৭৯৭	Tutor	জন মিলার	১১৬	ভাষাশিক্ষা	মিলার
২৭.	১৭৯৭	Bengal translations of regulations	ফস্টারস	৮০	সরকারি বিধি	কোম্পানী প্রেস
২৮.	১৭৯৮	Asiatick Researches Vol. V	—	—	সাঃ পত্র	ঐ
২৯.	১৭৯৮	Bengal translations	ফস্টারস্	২৮	ঐ	ঐ

	of the regulations					
৩০. ১৭৯৯	Vocabulary in two parts regulations	ঐ	৪২৪	শব্দকোষ	ঐ	
৩১. ১৭৯৯	Bengal translations of the regulations	ঐ	৩৬	সরকারি বিধি	ঐ	

উপরের তালিকার সরকারি বিধি-সম্বলিত ২২টি পুস্তকই বাংলা গদ্য-পুস্তক। এদের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০০০। বইগুলি সরকারি আইনাদির শুধু অনুবাদ। সাহিত্য সৃষ্টির কোন অবকাশ এখানে নেই, তবু এদের আলোচনা সে সময়ে প্রচলিত গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে অনুমান করতে অনেকটা সাহায্য করবে। তাছাড়া পরবর্তীকালের সাহিত্যের ওপর এদের প্রভাব পড়েছিল কিনা তারও পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

বাংলা গদ্যের এই নিদর্শন নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে, বাংলা গদ্যের জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র কম ছিল না। এই অনুবাদগুলি সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ছিল না, কারণ তাহলে কোম্পানী অনুবাদ চালিয়ে যেতে নিরুৎসাহিত হতো। এই সরকারি বিধির বিষয় ছিল অনুবাদকদের (দেশীয় পণ্ডিত) কাছে নতুন এবং ভাবানুবাদ নয়, আক্ষরিক অনুবাদ ছিল বিশেষ-ভাবে প্রয়োজন। ইংরেজী ও ফার্সীর সঙ্গে তুলনা করার সময় অর্থের মধ্যে কোন তারতম্য যাতে না থাকে তার ওপর বিশেষ নজর দিতে হয়েছিল, কারণ তা না হলে আইনঘটিত জটিলতা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। এরকম সঠিক ও সচ্ছন্দ অনুবাদের জন্য যেমন দরকার সুসংগঠিত ব্যাকরণ ও বাগ্‌বিধি, তেমনি সুপ্রচলিত সাহিত্যেরও প্রয়োজন হয়। আক্ষরিক অনুবাদকে আড়ষ্টতাশূন্য করার জন্য সাহিত্যের সহায়তা দরকার হয়। পাদ্রী টমাস এই সময়েই বাইবেল অনুবাদ করেন, তাঁর ভাষা ছিল দুর্বোধ্য, যেমন 'গোনার মাহিনা মিত্তু' কিন্তু খোদার দিয়া চির প্রমাই জিজ ক্রাইষ্ট হইতে।'[৯(ক)] সে তুলনায় এই আইনপুস্তকগুলির ভাষা সাধারণের বোঝার পক্ষে খুব অসুবিধার সৃষ্টি করেনি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়[১০]—'নবাব গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর ও নবাব উজিরর সমালেক বাহাদুরের হজুরে অনেক দরখাস্ত পড়েছিল, মাহাজন লোক তাহারা কোম্পানীর মুলুকে ও নবাব উজিরের মুলুকে সওদাগরি করে তাহারদিগের স্থানে যে লোকসান ও তকলিফ তাহারদিগের সওদাগরির জিনিষের ওপর জেয়াদা হাসিল।'

বিদেশী শব্দ-সম্বলিত এই বাংলা গদ্য হয়তো সুবোধ্য বলে এখন মনে না হলেও সে সময় সাধারণ লোকের কাছে মনে হয় অসুবিধার সৃষ্টি করেনি, কারণ তখন সবরকম দৈনন্দিন কাজে ফার্সী শব্দের ব্যবহার খুব বেশী প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে এই ব্যবহার অনেক কমে যায়।

এ সময়ের গদ্যের স্রষ্টা হিসাবে ডানকান, আপজন, ফস্টারস্ ও এডমনস্টোনের নাম বিশেষভা'ব পরিচিত, কারণ তাঁদের স্বাক্ষরে সরকারি বিধিগুলি প্রচারিত হয়েছে। তাঁরা সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁদের নামে আইন প্রচারিত না হলে তা প্রযোজ্য হবে না, কিন্তু এঁরাই যে বাংলা অনুবাদক ছিলেন এ কথা জোর করে বলা যায় না, বরং স্বাভাবিক-ভাবে অনুমান করা যায় বেতনভুক পণ্ডিত বা মুনশীরা বাংলা অনুবাদ করতেন এবং ইংরেজ কর্মচারীরা তার যথার্থতার জন্য দায়ী থাকতেন। এই অনুমানের সত্যতা পরীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। এই সব পণ্ডিত ও মুনশীরা সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে তাদের পরিচিত শব্দ ব্যবহার করে অনুবাদ করতেন, ফলে এঁদের রচনায় সংস্কৃত-আশ্রয়ী বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয়নি। পরবর্তীকালে গদ্যে ফার্সীবর্জন নীতি প্রবর্তিত না হলে গদ্যের জনপ্রিয়তা হয়তো আরো দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতো।

শ্রীরামপুর মিশন বা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা গদ্য হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি এবং প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা গদ্যের সংগঠন পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হয়নি। এই প্রভাব গদ্যের উৎকর্ষের উন্নতির দ্রুততা বৃদ্ধি করে। দীর্ঘকালের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক প্রয়াসই বাংলা গদ্যকে ধাপে ধাপে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বাধা আর অবহেলায় উন্নতির গতি হয়েছে স্তিমিত এবং উদ্দীপিত হয়েছে সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতায়। বিষয়টির ব্যাপক অনুসন্ধানের জন্য নিম্নলিখিতভাবে সুপরিকল্পিত প্রয়াসের প্রয়োজন।

(১) বাংলা পুঁথির মধ্যে গদ্যের অনুসন্ধান করা,

(২) প্রাপ্ত পুঁথির ভাষা ও সাহিত্য পর্যালোচনা করা,

(৩) ১৭৭৭-১৮০০ মধ্যে মুদ্রিত পুস্তকের আলোচনা করা,

(৪) পুঁথিপ্রণেতা ও মুদ্রিত পুস্তকের রচয়িতাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করা,

(৫) বিদেশী প্রভাব-মুক্ত ও বিদেশী প্রভাব-যুক্ত রচনার তুলনামূলক আলোচনা করা,

(৬) বাংলা গদ্য-গঠনে আঞ্চলিক প্রভাবের পর্যালোচনা করা ইত্যাদি।

উপরের আলোচনার মধ্য দিয়েই আঠারো শতকের বাংলা গদ্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে এবং বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভবকালও নির্ণয় করা যাবে। আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বাংলা গদ্য-পুঁথি। যা সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে গদ্য-পুঁথির সংখ্যা নিতান্তই অল্প, যদিও এই অল্পতাকে উৎপাদন পরিমাণের নির্দেশক বলা যায় না। আবার তালিকায় যা দেখা যায়, তার সব ক'টির অস্তিত্ব এখনও আছে কিনা সন্দেহ। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়'

হতে সংগৃহীত গদ্য-পুঁথির একটি তালিকা এখানে লিপিবদ্ধ করছি ঃ[১১]

পুঁথি	রচয়িতা	রচনাকাল	সংরক্ষক
স্মরণ মঙ্গল	নরোত্তম দাস	১৬০৬	এশিয়াটিক সোসাইটি
স্মরণ মঙ্গল	গিরিধর দাস	১৬৮০	পাঠগৃহ, বরাহনগর
বৈদ্যসার	অজ্ঞাত	১৭৬৫	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
স্মরণ মঙ্গল	নরোত্তম দাস	১৭৭৭	সাহিত্য পরিষদ
পাতড়া	রাধাকান্ত দাস	১৭৭৮	বিশ্বভারতী
পাতড়া	কবীন্দ্র	১৭৮৪	ঐ
প্রাচীন গদ্য (দিনলিপি)	অজ্ঞাত	১৭৯৩	ঐ
স্মরণ মঙ্গল	নরোত্তম দাস	১৭৯৭	মোক্ষদা সংগ্রহ
মনুষ্য প্রণালীতত্ত্ব	রসিকদাস গোস্বামী	১৮০০	বিশ্বভারতী
ইংরেজি ১৭৯৩ সালের ২ দ্বিতীয় আইন	—	—	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বেদান্তসার	স্বামী অদ্বয়ানন্দের শিষ্য	১৮০৩	কেরী লাইব্রেরী
পাতড়া	অজ্ঞাত	১৮০৪	বিশ্বভারতী
স্মরণমঙ্গল	ঐ	১৮১৩	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সুরথ মেধসী সংবাদ	ঐ	১৮১৮-এর পূর্বে	কেরী লাইব্রেরী
পৃথিবী ও ধর্ম্মের কথোপকথন	ঐ	১৮১৭	এশিয়াটিক সোসাইটি
আত্মজিজ্ঞাসা	কৃষ্ণদাস	১৮৩০	—
নিউ টেস্টামেণ্ট	উইলিয়াম কেরী (জু)	১৮২৬	কেরী লাইব্রেরী
বেদাদিতত্ত্ব	অজ্ঞাত	১৮৫১	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ণ নির্ণয়	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	১৮৫৭	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
গদ্য	অজ্ঞাত	১৮৬৬	বিশ্বভারতী
রাগাত্মিকা তত্ত্ব	ঐ	—	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ষোল নাম বিচার	ঐ	—	ঐ
সিদ্ধ ঔষধ	ঐ	—	ঐ
স্মৃতি সংগ্রহ	রাধাবল্লভ স্মৃতিবাগীশ	—	—
স্বরোদয়	অনন্তধন	—	—

পুঁথি	রচয়িতা	রচনাকাল	সংরক্ষক
দায়ভাগ	রঘুনন্দন ভট্টাচার্য	—	—
পঞ্চতন্ত্র	গোবিন্দদাস	—	—
দর্শন প্রসঙ্গ	অজ্ঞাত	—	—
পরীক্ষিতের নিকট শুকদেবের আগমন	ঐ	—	—
পাতড়া (গদ্য)	ঐ	—	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
চৈতন্য সম্বন্ধে	ঐ	—	ঐ
বাংলা গদ্য	ঐ	—	ঐ
গদ্য রচনা	ঐ	—	—
পুরাতন গদ্য	ঐ	—	বিশ্বভারতী
পুরাতন চিঠিপত্রের তাড়া	ঐ	—	ঐ
বস্তু নির্ণয়	ঐ	—	সাহিত্য পরিষদ
বৈদ্যনাথ আদেশ	ঐ	—	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ভুক্ত অন্নাদি	ঐ	—	শ্রীহট্ট সাহিত্য সমাজ
বলীবামন সংবাদ	ঐ	—	সংস্কৃত কলেজ
বত্রিশ সিংহাসন	ঐ	—	এশিয়াটিক সোসাইটি
মুষ্টিযোগ শিক্ষা পদ্ধতি	ঐ	—	সংস্কৃত কলেজ
সহজ বস্তুসিদ্ধ প্রণালী	রাধানাথ দাস	—	হেমচন্দ্র সংগ্রহ
মঞ্জরী সখি পরিচয়	অজ্ঞাত	—	বিশ্বভারতী

এই তালিকার ৯টি পুঁথির রচনার তারিখ উনিশ শতকের আগে, ২২টির রচনাকাল অজ্ঞাত এবং ১০টি রচিত হয়েছে উনিশ শতকে। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের তালিকা সমন্বয়টি সুদীর্ঘকালের গবেষণালব্ধ ফল এবং বহু অনুসন্ধানের পর সমন্বয়টি সংকলিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও এখনও অনুসন্ধান করা যেতে পারে বিশেষ করে ব্যক্তিগত সংগ্রহে। তাছাড়া, পদ্য-পুঁথির মধ্যেও কিছু কিছু গদ্যের নিদর্শন থাকা অসম্ভব নয়। সেজন্য উনিশ শতকের সব পুঁথিই খুলে দেখা দরকার। বাংলা পুঁথির অনেক আলোচনা হলেও গদ্য-পুঁথির আলোচনা খুব কম হয়েছে। বাংলা পুঁথিতে গদ্যের কিরূপ নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

১. "কর্ম্মের পরিচয় : ব্যাপারবৎ কারণের নামকরণ কারণ জন্য হইয়া কার্য্য জনক যে হয় তাহার নাম ব্যাপার।"[১২]

২. "স্বরূপচন্দ্র দাসের রোকা ঘ্রীহৎ বেচারাম চৌধুরী ভায়া জিম্বী রামহরি ঘোষকে পাঠাই ইহাকে ৫ পাঁচটি টাকা দিবেন অবষ্যই কোনই আর করিবেন না ইহাকে রাহা খরচ কড়ি দিবেন।"[১৩]

৩. "শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমান লাভ হানি জয় পরাজয় ইত্যাদি সকলের নাম দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বেতে যে সমভাব তাহাকে তিতিক্ষা বলি।"[১৪]

৪. "দুই পুরুষ দুই রথে আরোহণ করিয়া কোন দেশে যাইতেছিল পথমধ্যে এক পুরুষের রথ পুড়িয়া গেল অশ্ব থাকিল দ্বিতীয় পুরুষের অশ্ব নষ্ট হইল রথ থাকিল। সেই দুই পুরুষ যুক্তি করিয়া এক পুরুষের অশ্বকে অন্যের রথেতে যোজনা করিয়া অনায়াসে প্রাপ্তব্য দেশকে পাইল।"[১৫]

৫. "শ্রীযুত কোম্পানি ইংরেজ বাহাদুরের অধিকারে বাঙ্গলা দেশের বিশিষ্ট মর্য্যাদা ও নানাবিধ দ্রব্য জন্মান ও প্রস্তুত করণের কারণ যে সকল সামিগ্রী চাহি তাহার উৎপত্যভূমি হইতেই হয় অতএব বিক্ষাত আছে জে চাস কর্ম্মে'র আধিক্যে মহাজনি দ্রব্যাদি অনেক জন্মে ও তৎসহযোগে দেশের সম্পত্যও বিস্তর হইতে পারে।"[১৬]

৬. বনে সুরথ রাজার সহিত মেধাসি মুনির যে কথোপকথন হইয়াছিল সেই কথোপকথন আমি শ্রবণ করিতে আসিয়াছি তাহা মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আজ্ঞা কর।"[১৭]

এই শতকের গদ্যের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল এবং সবরকম ভাব-প্রকাশে সামর্থ্যে'র অভাব ছিল না। সুপরিণত সাহিত্য অনুপস্থিত থাকলে তা সম্ভব হোতো না। এ-সময়ের গদ্যের সবচেয়ে বেশী প্রবণতা ছিল সাধারণ অল্পশিক্ষিত (বিশেষ করে সংস্কৃতে অজ্ঞ) মানুষকে সহজে বোঝানোর চেষ্টা। বাংলা 'গদ্যের পাঠক ছিল বেশীর ভাগ দরিদ্র গ্রামবাসী এবং সংস্কৃতে অজ্ঞ, রচয়িতাদের মধ্যেও অনেক সংস্কৃত জানতেন না। তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বানান ও ব্যাকরণের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয়নি। কিন্তু সাধারণের সুপরিচিত শব্দের ব্যবহারের আধিক্য আছে। সাহিত্যিক উৎকর্ষ'তার জন্য যে পরিবেশ ও প্ররোচনার প্রয়োজন তার অভাব ছিল খুব বেশী। আমরা সে যুগের গদ্যের বিশেষ পরিচয় পাইনি বটে, তবে অনুমান করা যায় যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে'র গদ্য লেখকেরা এর সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন এবং অনুপ্রেরণা ও অভিজ্ঞতা দুই-ই অর্জন করেছেন পূর্ব'বর্তীদের রচনা হতে। উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকের গদ্য-লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রামরাম বসু, উইলিয়াম কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, তারিণীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ মুন্সী, গোলোকনাথ শর্মা, হরপ্রসাদ রায়, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি, রামমোহন রায়, ফেলিক্স কেরী, উইলিয়াম ইয়েট্‌স্, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রমুখ। এঁদের মধ্যে রামমোহন রায় ছাড়া সকলেই কেরী বা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বাংলা ভাষার প্রতি কেরীর ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং এই ভাষার সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস ছিল সুগভীর। তিনি বহু প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেন এবং অনুলিপি করান। কিন্তু খুব দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৮১২ সালে শ্রীরামপুর প্রেসে যে বিরাট অগ্নিকাণ্ড হয় তাতে তাঁর বহু পাণ্ডুলিপি ও পুঁথি ভস্মীভূত হয়ে যায়। তাই তাঁর খুব অল্প সংখ্যক পুঁথিই সংরক্ষিত হয়েছে যার মধ্যে আছে ২/৩টি গদ্য পুঁথি। কেরীর অনুগামী দেশীয় পণ্ডিতবৃন্দ ও বিদেশী মনীষীরা কেরীর মতই পূর্ববর্তী-কালের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু রামমোহন প্রমুখ বিত্তশালী দেশীয় মনীষীরা আঠারো শতকের বাংলা ভাষাসাহিত্য সম্বন্ধে খুবই খারাপ ধারণা পোষণ করতেন। ডাঃ শিশির দাস লিখেছেন: "Many educated Bengalees of late eighteenth century had little knowledge of Bengali literature. Rammohan Roy in his Bengali Grammar made a very disparaging remark about the Bengali literature of the earlier period."[১৮] কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহনের এরূপ ধারণা জন্মায় তা জানা যায় না অথচ তিনি তাঁর সময়ে বাংলা গদ্যের শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁর এই অভিমত পরবর্তীকালের সমালোচকদের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সমসাময়িক সময়ের বাংলা গদ্যের প্রধান সংগঠক পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কিন্তু প্রাচীন ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলা গদ্যকে সংস্কৃত-আশ্রয়ী বলিষ্ঠ রূপ দেবার চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুঞ্জয়কে অনুসরণ করেই পরবর্তীকালের গদ্য-সাহিত্য গড়ে ওঠে, যদিও সাধারণ লোকের কথ্য ভাষা থেকে বিলক্ষণ দূরত্ব বজায় রাখায় বাংলা গদ্য শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর কুক্ষিগত হয় এবং গদ্যের এই ধারাবাহিকতা এখনও বর্তমান। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই বাংলা সাহিত্যের ওপর পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব পড়ে এবং গদ্যের উন্নতিও হয় দ্রুতহারে। উন্নতির এই দ্রুত হারই আমাদের বিভ্রম ঘটিয়েছে। আঠারো শতকের গদ্যপ্রবাহ যতটুকু জনজীবনবাহী উনিশ শতকের গদ্যের চরিত্র তা থেকে ভিন্নরূপ ধারণা করতে আমরা ইতস্ততঃ করি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের অনুরাগীদের কাছে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে তোলা দরকার।

আঠারো শতকের বাংলা গদ্যের উত্তরসূরি

আঠারো শতকের জানা-অজানার কুয়াশায় ঢাকা গদ্যের পথ ধরে উপস্থিত হয়েছে উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকের বিতর্কে জর্জরিত গদ্য-সাহিত্য। সাহিত্যপদবাচ্য কিনা এ-সময়ের গদ্য এ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও অস্বীকার করা যায় না এই গদ্য পরবর্তীকালের বলিষ্ঠ পটভূমি রচনা করে আর বিষয়-বৈচিত্র্যের পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গদ্যের কাঠামোকে করে সুদৃঢ়।

গদ্যরচনায় প্রধান ভূমিকা নেন শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতবৃন্দ। দ্বিতীয় দশকের শেষের দিকে রামমোহন এঁদের সঙ্গে যোগ দেন। এঁদের রচনার তুলনামূলক মূল্যায়ন খুব বেশী হয়নি বটে কিন্তু অনেক সমালোচকই এ-সময়ের গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তি রচনায় রামমোহনকে এককভাবে মর্যাদা দিতে রাজী নন। যেমন, প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, 'নিছক গদ্য লেখক হিসাবে রামরামের স্থান রামমোহনের উপরে' (বাংলাগদ্যের পদাঙ্ক, পৃঃ ৩৮)। ফাদার দ্যাতিয়েন লিখেছেন, "এমন প্রাঞ্জল ভাষায় এতগুলি গল্প ১৮১২ সালে লিখতে পারতেন এমন কি কোন বাঙ্গালীর নাম সাহিত্যেতিহাসে নামের তালিকায় মেলে?·····রচনাকালে কেরী এমন একজনের সাহায্য পেয়েছেন যিনি—কেরীর সম্ভবতঃ নিজেরই অজান্তে সত্যিকারের সাহিত্যিক ছিলেন।" (কেরীসাহেবের ইতিহাসমালা, পৃঃ ৩১)। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্তের 'মৃত্যুঞ্জয় থেকে বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধে আছে, "ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মৃত্যুঞ্জয় ভালো গদ্য লিখেছেন সন্দেহ নেই। রামমোহনের চেয়ে উন্নত তাঁর শৈলী।" (বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ, পৃঃ ৬২)। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "কিন্তু যাকে পরিচ্ছন্ন গদ্য বলে, সাহিত্যে যার প্রধান পরিচয়, রামমোহনের গদ্যে সে ধরনের প্রসন্নতা ও সচ্ছন্দ প্রবাহ ততটা লক্ষ্য করা যায় না, যতটা পাওয়া যায় মৃত্যুঞ্জয়ের পাঠ্য কেতাবে, বেদান্তচন্দ্রিকা-প্রবোধচন্দ্রিকায়···" (পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২)। আরও অনেকে নানারূপ মন্তব্য করেছেন, কিন্তু সকলের রচনার তুলনামূলক আলোচনা খুব কমই হয়েছে। এ সময়ের গদ্য লেখকদের মধ্যে কেরী, মৃত্যুঞ্জয়, রামরাম বসু ও রামমোহনই প্রধান। এঁদের রচনার তুলনামূলক কিছু আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হল—

(ক) একটি দুষ্প্রাপ্য পুঁথি বেদান্তসার (১৮০৩) ও রামমোহনের বেদান্ত-সারের (১৮১৫) গদ্যের নিদর্শন ঃ

১৮০৩-এর বেদান্তসার

১। "···পরম কারুনিক শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জুনের দুর্য্যোধনাদির সহিত যুদ্ধকালে আমার ইহারা আত্মীয় আমি এই ভীষ্মাদিকে মারিলে ইহার পাপ ভোগ করিব ইত্যাদি নানাপ্রকার অন্যায় অজ্ঞানমূলক অহঙ্কার এবং সমকার তাহার নিবৃত্তির নিমিত্তে ঐ অর্জুনকে সর্ব্ববেদের সারার্থরূপ ঐ অধ্যাত্ম বিদ্যা বেদব্যাস নামা মহামুনি

১৮১৫-এর বেদান্তসার

১। ওঁ তৎসৎ॥ অর্থাৎ স্থিতি-সংহার-সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি তেহোঁ সত্তা-মাত্র হয়েন। বেদের প্রমাণ এবং মহর্ষির বিবরণ আর আচার্য্যের ব্যাখ্যা অধিকন্তু বুদ্ধির বিবেচনা এ সকলেতে যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার নিকট শাস্ত্র এবং যুক্তি দুইই অক্ষম হয়েন। এই বেদান্তসারের বাহুল্য এবং বিচার যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা

১৮০৩-এর বেদান্তসার

সূত্রে বদ্ধ করিলেন সেই সূত্র সকলের পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভাষ্যরূপ সমুদ্র করিয়াছেন তাহাকে মন্থন করিয়া শ্রীযুক্ত অদ্বয়ানন্দ পরমহংস সন্ন্যাসির শিষ্য কেহো বেদান্তসার নামে যে গ্রন্থ করিয়াছেন ঐ গ্রন্থের অর্থ সকল গৌড়দেশীয় ভাষাতে শ্রীল শ্রীঅমুক নামা বড় সাহেবের অধিকার সময়ে আঠারো শত তিন সালে রচিত হইল।"

২। "যে হেতুক ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালে ও সর্ব্বদেশে ও আকাশাদি সর্ব্ব পদার্থে যে থাকে বস্তু শব্দের অর্থ সেই তাহা ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য কেহো হইতে পারে না ব্রহ্ম শব্দের অর্থ নিরবধিক মহত্ত্ব-বিশিষ্ট যিনি তিনি অতএব বস্তু ও ব্রহ্ম এই দুই শব্দ একার্থক তাহার স্বরূপ বিশুদ্ধজ্ঞান মাত্র জ্ঞানশব্দ ও চিৎ শব্দ একার্থক যাহার কখন বাধা নাই অর্থঅভাব নাই তাহাকে সত্য বলি তাহাও ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য কেহো নয় অতএব সচ্চিত এই দুই শব্দের একই অর্থ একার্থক। এই প্রযুক্ত সর্ব্বশাস্ত্র ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ করিয়া কহেন তিনিই অনন্ত যেহেতুক তাহার অন্ত নাই তিনিই অন্বয় যেহেতুক তাঁহার ওন্য দ্বিতীয় বস্তু নাই অতএব সচ্চিদানন্দ অনন্ত অন্বয় যে ব্রহ্ম তিনিই বস্তু।

১৮১৫-এর বেদান্তসার

হয় তাঁহারা বেদান্তের সংস্কৃত ও ভাষা বিবরণে জানিবেন।

২। সমুদায় বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে জানা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে ইহার উল্লেখ বেদান্তের প্রথম সূত্রে ভগবান বেদব্যাস করিয়া শ্রুতি এবং শ্রুতি সম্মত বিচারের দ্বারা দেখিলেন ব্রহ্মের স্বরূপ কোন মতে জানিতে পারা যায় না অর্থাৎ ব্রহ্ম কি আর কেমন এমত নিদর্শন হইতে পারে না যেহেতু শ্রুতিতে কহিতেছেন।

৩। শাস্ত্র যে বেদ তাহারো কারণ ব্রহ্ম হয়েন অতএব জগৎ কারণ ব্রহ্ম। বেদে কহেন। আকাশাদেব সমুৎ-

১৮০৩-এর বেদান্তসার	১৮১৫-এর বেদান্তসার
	পদ্যন্তে। ছন্দোগ্য। আকাশ হইতে জগতের উৎপত্তি হয় ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা আকাশ জগৎ কারণ না হয় যেহেতু শ্রুতিতে কহিতেছেন।

উপরে উল্লিখিত সামান্য অংশ হতেই বোঝা যায় অদ্বয়ানন্দ পরমহংসের শিষ্য সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষকে সহজভাবে ব্রহ্ম ও বেদান্তের সম্বন্ধে ধারণা করাবার চেষ্টা করেছেন। রামমোহনের বক্তব্য বুঝতে হলে কিছু সংস্কৃত জানা আবশ্যক। ভাষার সহজবোধ্যতা এখানে অনেক কম। ১৮০৩-এর বেদান্তসার হতে বোঝা যায় সাধারণ মানুষের কাছে বেদান্তের পরিচয় অজ্ঞাত ছিল না।

(খ) রচনাশৈলীর তুলনা

রামরাম বসু	কেরী অথবা কেরী সংকলিত গ্রন্থের রচয়িতা (ইতিহাসমালা)	মৃত্যুঞ্জয়	রামমোহন
১। ভাষাকে সহজ ও গতিশীল করার জন্য ফার্সী ব্যবহার করেছেন, তবে বাহুল্য নেই (শতকরা ৩·৪%)। অনেক স্থলে সু-প্রযুক্ত।	১। শব্দগুলি সহজবোধ্য একই শব্দের তৎসম ও তদ্ভবরূপ ব্যবহার হয়েছে। (গর্ভ, গাধা, মস্তক, মাথা)	১। বাক্য ছোট, গঠনভঙ্গী সরল। দীর্ঘ জটিল বাক্যের সংখ্যা কম।	১। বাক্যগুলি বড় জটিল এবং অনেক বাক্যাংশে গঠিত, এক কর্তার সঙ্গে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া।
২। রচনায় ব্যাকরণগত বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয়নি।	২। সম্বন্ধবাচক কারক নিয়মিত; বিভক্তি, পদ, প্রভৃতি কেরীর ব্যাকরণ অনুযায়ী।	২। সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার বেশী। কর্তা ও ক্রিয়ার নৈকট্য বাক্যের কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে। পদ ও বিভক্তির ব্যবহার সামঞ্জস্যপূর্ণ।	২। কর্তা ক্রিয়ার দূরত্বের জন্য অনেক স্থলে অর্থ বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে।

৩। সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ খুব সুখকর হয়নি।	৩। অসমাপিকার সাহায্যে যুক্ত ক্রিয়াপদের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। (লিখিয়া দিয়া, কহিয়া দেই ইত্যাদি)।	৩। বাক্যের মধ্যে ভাবাবেগের উত্থান-পতন বোঝা যায়।	৩। বিভক্তির ব্যবহার সঙ্গত হলেও ক্রিয়াপদ ব্যবহারে অসঙ্গতি আছে। (যেমন সহিষ্ণুতা করে, উপদেশ করিয়াছে ইত্যাদি)।
৪। শব্দবিন্যাসে দেশী ও বিদেশী বাগ্‌ধারার সংমিশ্রণের চেষ্টা করেন।	৪। পরোক্ষ উক্তির ব্যবহার অল্প। কোন কোন স্থলে ক্রিয়াপদের কর্তা অপ্রকাশিত। ক্রিয়াপদের ব্যবহার অশুদ্ধতাদুষ্ট।	৪। বাক্য সুনির্দিষ্ট আকৃতিযুক্ত ও গতিশীল।	৪। রচনাশৈলী সংস্কৃত ভাষ্যকারদের অনুকরণে হওয়ায় যুক্তির পথ ধরে এগিয়েছে।
৫। রচনার উৎকর্ষ ও গতিশীলতা বাড়াবার জন্য ছোট ও বড় উভয় প্রকার বাক্য ব্যবহার করেন। ছোট বাক্য সুন্দর কিন্তু বড় বাক্যে ভারসাম্য বজায় থাকেনি।	৫। সাহিত্য-প্রয়াসের লক্ষণ সুস্পষ্ট।	৫। ভাষা চিত্রময়	৫। বাক্যের আকৃতি সুনির্দিষ্ট নয়।
৬। কথোপকথনে মৌখিক ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। (রাজকন্যা কহিলেন, ক্ষোভ পাইবা না তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিবা তাহা নিতান্ত আমি কহিব তোমাকে)	৬। কাহিনী-প্রধান গল্পগুলির ভূমিকা ও উপসংহার উপভোগ্য দু'একটি গল্পে কাব্যরূপ সুস্পষ্ট।		৬। ভাষা চিন্তার উদ্রেক করে।

বাংলা গদ্যকে সুসংহত, সাবলীল ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের অবদানই মূল্যবান এবং প্রত্যেকে পূর্বশতকের গদ্যের সহিত পরিচয়কে নিজেদের রচনায় কাজে লাগিয়েছেন।

(গ) উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকের গদ্যের কিছু নিদর্শন

১৮০১ঃ "ওটেবুন সেদিন কলাঘাটার হাটে গিয়াছিলাম তাহাতে দেখিয়াছি সুতোর কপালে আগুন লাগিয়াছে। পোড়া কপাল তাঁতি বলে কি আটপন করে সুতাখান। সে সকল সুতা আমি এক কাহন বেচেছি টে।" (কেরীর কথোপকথন, ১৮০১)

১৮০২ঃ "অঙ্গভূমি রম্যস্হান মিষ্টজল বালুকাযুক্ত দোয়াঁসভূমি বাতাস সুগন্ধ দেশে ধান্য দুগ্ধাদি অতিসুলভ। লোকেরা সদাচারী জিতেন্দ্রয় সুভাজন সর্ব্বমতে উত্তম স্হান।"
(রামরাম বসুর লিপিমালা, পৃঃ ২৪)

১৮০২ঃ ..."তিনি এক পরমেশ্বর তাহার স্বরূপ এই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা কার্য্যরূপে এবং কারণরূপে অভিব্যক্ত সকলের অন্তঃকরণ ব্যাপারসাক্ষী পাদহীন অথচ সর্ব্বত্রগ এবং পাণিহীন সর্ব্বগ্রাহী নেত্রহীন সর্ব্বদর্শী শ্রোতহীন সর্ব্বশ্রোতা তিনি সকলকে জানেন তাহাকে কেহ জানে না সর্ব্বস্হিত কিন্তু সকলেরি দুর্লভ তাহার কেহ আধার নয় তিনি সকলের আধার সচ্চিদানন্দ মাত্রস্বরূপ তাহার শক্তি..." (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বত্রিশ সিংহাসন, ১৮০২)

১৮০৪ঃ "উত্তর২ নানা বিদ্যাবৃদ্ধি হওয়ার বাধা এবং এই দোষের সার্থকতম প্রতিকার সাহিত্য ও শিল্প জ্যোতিষ ও স্মৃতি পুরাণ ও কণাদি বিদ্যা সংস্কৃত গ্রন্হ হইতে তরজমা করা কেননা লোকে বলে হিন্দুরদের পূজাদি ভজনা ও গৃহাদি কর্ম সকলি ইহার মধ্যে..."
(A. B. Tod, Thesis at the desputation of Fort William College)

১৮০৫ঃ "হে মহারাজ সকল ঋতুরাজ বসন্ত আপনাকার বিলাস বিপিন সমূহে প্রবেশ করিলেন বনরাজি নবীন ফলপুস্পস্তবকমঞ্জরীভারেতে পরম শোভাবিষ্ট হইয়াছেন।" (কেরীর বাংলা ব্যাকরণ, ২য় সং-এ উদ্ধৃত)

১৮১২ঃ "পুরুষ আপন যোগ্যতাপ্রযুক্ত উচ্চপদ ও অনুরাগ পায় নতুবা কেবল সদ্বংশজাত—ইহাতে বড় হয় না। যদি কেবল বংশমর্য্যাদাতে সকলে বড় হইতে পারিত তবে সমুদ্ররত্নাকর হইতে কালকূট বিষ উৎপন্ন হইয়াছে সে বিষ পাইয়া কেহ তৃপ্ত হয় না আর অধমবংশ পঙ্ক

তাহাতে জাত যে পদ্ম তৎপ্রাপ্তিতে কাহার আহ্লাদ না হয়…"
(কেরীর ইতিহাসমালা)

১৮১৬ ঃ "ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন যে সমুদায় বেদ একবাক্যতায় বুদ্ধি মন বাক্যের অগোচর যে ব্রহ্ম কেবল তাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতেছেন সেই সূত্রের অর্থ সর্বসাধারণ লোকের বুঝিবার নিমিত্তে সংক্ষেপে ভাষাতে বিবরণ করা গিয়াছে।" (রামমোহনের ঈশোপনিষৎ)।

১৮১৮ ঃ চুম্বকমণি একপ্রকার লৌহ তাহার আশ্চর্য যে যে গুণ তাহার স্থূল বিবরণ শুন। যদি চুম্বকমণি কোন লৌহের বা ইস্পাতের নিকটবর্তী হয় তবে সেই লৌহ চুম্বকমণির অভিমুখে আইসে এবং যদি আর কোন ব্যবধান না থাকে তবে সে মণি ও লৌহ কিম্বা সে ইস্পাত উভয়ে একত্রে মিলাইলে পুনর্বার পৃথক করিতে বল অপেক্ষা করে। (দিগ্‌দর্শন, ১৮১৮)।

১৮১৮ ঃ জরমনি দেশে একজন চিকিৎসক এক ফিকির বাহির করিয়াছে তাহার দ্বারা যে ব্যক্তির নাসিকা কাটা গিয়াছে তাহার নাসিকা পুনর্বার হয়। ১৮১২ সালে একজন সিপাহীর নাসিকা কাটা গিয়াছিল। সে এই চিকিৎসকের নিকট গেল। সে চিকিৎসক একখান হাড় নাসিকার মত গঠিত করিয়া সেই নাসিকার স্থলে বসাইয়া দিল এবং বাহুমূলের নীচের একটুকি চামড়া সেই নাসিকার পরিমিত কাটিয়া নাসিকাতে বসাইয়া দিল তাহাতে নাসিকা পূর্ববৎ সুস্থ হইল ! (সমাচার দর্পণ, ১৮১৮)।

১৮২০ ঃ অন্য দেশেতে মনুষ্যজাতি যেমন দুই প্রকার অর্থাৎ মূর্খ এবং জ্ঞানী তদ্রূপ এতদ্দেশেতেও আছে। মূর্খেরা সর্বদা পশুবৎ তাহারদিগের মধ্যে কেহ জ্ঞানাভিলাষী নয় কিন্তু নিতান্ত বিদ্বান যে ব্যক্তি তিনি তদ্রূপ নন তাঁহার চিত্ত অন্যপ্রকার বিশেষতঃ কোন এক বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর হইলে কিম্বা কোন একসময় কোন শিল্পকর্ম দেখিলে যাবৎ সে বিষয়ের হেতু কিম্বা সে বিদ্যার আদ্যোপান্ত কারণ জ্ঞাত না হন তাবৎ তাঁহার মনে কোন সুখ প্রবিষ্ট হইতে পারে না…"
(বিদ্যাহারাবলী—ফেলিক্স কেরী)

গ্রন্থপঞ্জী

১. বাংলার গদ্যের জনক কে? একটি বিতর্ক। দৈনিক বসুমতী, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৮২

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা। পৃঃ ৮

৩. চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল : বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ। পৃঃ ৪

৪. চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল : বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ। পৃঃ ৪

৫. Mitra, Sibratan : Types of Early Bengali Prose. p. 37

৬. চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল : বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ। পৃঃ ৮

৭. ঐ ঐ পৃঃ ৬৭

৮. Shaw, Graham : Calcutta Printing to 1800

৯. " "

৯ক. Baptist Magazine, 1853, p. 473

১০. Shaw, Graham : Calcutta Printing to 1800

১১. ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন : বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়

১২. বসু, নগেন্দ্রনাথ : সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩০৬, পৃঃ ৩২৫

১৩. নামহীন অঙ্কের পুঁথি (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)

১৪. অজ্ঞাত : বেদান্তসার (পুঁথি, কেরী লাইব্রেরী)

১৫. ঐ : ঐ

১৬. নামহীন অঙ্কের পুঁথি (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)

১৭. অজ্ঞাত : সুরথমেধসী সংবাদ (পুঁথি, কেরী লাইব্রেরী)

১৮. Das, Sisir Kr. : Early Bengali Prose, p. 83.

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের পুঁথি

এদেশে ইংরেজরা আসার আগে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা ছিল না বলে যে প্রচলিত ধারণা[১] তা বোধ হয় ঠিক নয়। সতেরো-আঠারো শতকে বাংলার শিল্পজাত দ্রব্য সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য[২]। এই ধরনের উৎকৃষ্ট শিল্পের পিছনে নিশ্চয়ই বিজ্ঞানের উন্নততর পটভূমিকা ছিল। কিন্তু সে যুগের বিজ্ঞানচর্চার রূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া খুবই কঠিন। কিছু তথ্য ও উপাদান অনাদৃতভাবে বাংলা পুঁথির মধ্যে লুকিয়ে আছে। এই পুঁথিগুলি হয়তো এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করতে পারবে। পাশ্চাত্ত্য ধারায় শিক্ষা প্রচলিত হবার আগে এদেশে শিক্ষার দুটি স্তর ছিল। উনিশ শতকের আগে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা এবং সংস্কৃত ও আরবী-ফার্সীর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা ছিল তথাকথিত উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাভাষা ছিল অপাঙ্‌ক্তেয়। জ্ঞানের উচ্চস্তরে বাংলা-ভাষার ব্যবহার বিশেষ দেখা যায়নি। কিন্তু এই অনাদর সত্ত্বেও গরিব সাধারণ মানুষের দরদ ও পরিচর্যায় সুসমৃদ্ধ বাংলাভাষায় এ যুগে লেখা হয় বহু বিচিত্র বিষয়ে অসংখ্য পুঁথি যার মধ্যে আছে সে সময়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুস্পষ্ট পরিচয়। উপেক্ষা ও অবহেলায় অধিকাংশ পুঁথিই প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন দরদি মনীষীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কিছু পুঁথি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং সেগুলি কয়েকটি বিশিষ্ট সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।

সম্প্রতি সুদীর্ঘ কালের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বাংলা, ভারত ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত বাংলা পুঁথির তালিকা-সমন্বয় প্রকাশ করেছেন।[৩] প্রকাশক এশিয়াটিক সোসা-ইটি অফ্‌ বেঙ্গল। বর্ণানুক্রমে সাজানো এটি তালিকা-সমন্বয়ের প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ডে বিষয়ানুযায়ী তালিকা প্রকাশিত হবার কথা। শিক্ষিত সমাজের ঔদাসীন্য থাকা সত্ত্বেও এতগুলি পুঁথির রক্ষা পাওয়া খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার। এই বিপুল সংখ্যার বাংলা পুঁথিতেই সে যুগের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার মান নির্ণয়ের হদিস পাওয়া যাবে এবং এইগুলিই সে সময়ের সামাজিক ইতিহাসের মূল্যবান আকর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে তাহারা দর্শন বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না।"[৪] সে যুগে ধর্মপ্রবণতাই পুঁথি সংরক্ষণের প্রেরণা জুগিয়েছে, তাই ধর্মসম্পর্কহীন পুঁথি-গুলি অনেক কম যত্ন পেয়েছে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের পুঁথির কয়েকটি তালিকা এখানে প্রদত্ত হল—

ক. রচনা বা অনুলিপির কাল-অনুযায়ী

আঠারো শতকের পূর্বের	আঠারো শতকের	উনিশ শতকের প্রথমার্ধের	উনিশ শতকের শেষার্ধের	অজ্ঞাত	মোট
১০	৩৬	৮৫	৪০	৬৬৩	৮৩৪

অনেক পুঁথিই অনুলিখিত, তাই মূল রচনার সময় জানা যায় না। যাদের রচনাকাল অজ্ঞাত তাদের মধ্যে অনেকগুলিই উনিশ শতকের আগের রচনা।

খ. বিষয়-অনুযায়ী

বিষয়	উপবিভাগ	উপবিভাগ	উপবিভাগ	উপবিভাগ	উপবিভাগ	মোট
চিকিৎসা	সাধারণ ১৪৭	সূত্রাদি ৩৯	প্রণালী ৪৯	রোগ ২৫	ঔষধ ৩০	২৯৩
গণিত	,, ২২	হিসাব ৪৭	সূত্র ৭৬	—	—	১৪৫
জ্যোতিষ	,, ৬৮	গ্রহনক্ষত্র ১০	কাল ১৮	পঞ্জিকা ৪	ফলিত ১৩	১১৩
বস্তুতত্ত্ব	,, ১৪	তত্ত্ব ১৭	নির্ণয় ১৪	—	—	৪৫
মনোবিদ্যা	,, ২	শিক্ষা ৯৮	কামশাস্ত্র ১০	তত্ত্ব ২	—	১১২
ভূগোল ও ভূবিদ্যা	,, ১	সৃষ্টি ১৪	আবহাওয়া ৩	ভূমি ৫	ভূমিকম্প ৩	২৬
জীব ও প্রাণীবিদ্যা	জন্মবৃত্তান্ত ১২	তত্ত্ব ১৩	মাছ ১	—	—	২৬
শারীরতত্ত্ব	সাধারণ ৪	,, ১১	নির্ণয় ১৬	—	—	৩১
রসায়ন	ধাতু ৫	অধাতু ২	অজৈব ২	জৈব ৫	—	১৪
কৃষিবিদ্যা	সাধারণ ৩	জমি ৩	ধানচাষ ৩	সার ১	—	১০
কারিগরিবিদ্যা	জমি ২	গৃহ ৬	ডিঙ্গা ১	—	—	৯
উদ্ভিদবিদ্যা	বীজ ১	তামাক ১	ভেষজ ১	বনজ ৬	—	৯
পদার্থবিদ্যা	সাধারণ ১	—	—	—	—	১
						৮৩৪

গ· সংগ্রহশালা-অনুযায়ী

সংগ্রহশালা	চিকিৎসা	গণিত ও জ্যোতিষ	মনোবিদ্যা ও শারীরবিদ্যা	বস্তু ও পদার্থ	ভূগোল	কৃষি ও ভূবিদ্যা	রসায়ন ও জীববিদ্যা	প্রাণী ও উদ্ভিদ	কারিগরি	মোট
আব্দুল করিম সং ঢাকা	৩	১৪	২	—	২	—	১০	—	৬	৩৭
উত্তরবঙ্গ বিশ্ব	১	—	—	—	—	—	—	—	—	১
এশিয়াটিক সো সং	৯	৪	৩	—	১	—	—	১	—	১
কলি বিশ্ব সং	২৫	৮	৪৩	১১	৪	৪	২	১	১	৯৯
সংস্কৃত কলেজ / মনীন্দ্র কলেজ	২	১	—	১	—	—	—	—	—	৪
গৌহাটি বিশ্ব সং	৩	২	৪	—	—	—	—	—	—	৯
ঢাকা বিশ্ব সং	৪৪	১৮	১৫	১	—	—	—	৪	—	৮২
বঙ্গীয় সা পরিষদ সং	৫	৭	৮	৪	—	১	—	১	—	২৬
বরাহনগর পাঠবাড়ি	—	১	৮	৬	—	—	—	২	—	৭১
বর্ধমান সাহিত্যসভা	২	২২	৩	২	২	—	১	—	—	৩২
বাঁকুড়া হেম পালিত সং	—	১০	১	১	—	—	—	—	—	১২
বিশ্বভারতী সং	১১১	১২৫	২২	১০	৬	৩	৯	৪	২	২৯২

সংগ্রহশালা	চিকিৎসা	গণিত ও জ্যোতিষ	মনোবিদ্যা ও শারীরবিদ্যা	বস্তু ও পদার্থ	ভূগোল	কৃষি ও ভূবিদ্যা	রসায়ন ও জীববিদ্যা	প্রাণী ও উদ্ভিদ	কারিগরি	মোট
বিষ্ণুপুর সা পরিষদ	৪	২	২	—	—	—	—	১	—	৯
বীরভূম পল্লীশ্রী	৪	১০	৩	—	—	—	—	—	—	১৭
,, শিবচরণ সং	৪	১	—	২	—	—	—	—	—	৭
বেনারস হিন্দু বিশ্ব	১	—	—	—	—	—	—	—	—	১
মেদিনীপুর সা সং	—	২	৩	—	—	—	—	—	—	৫
মোক্ষদা সং	৬	৩	৬	৩	৫	২	—	২	—	২৭
রবীন্দ্রভারতী সং	১	—	—	—	—	—	—	—	—	১
বাংলাদেশ (ঢাকা ছাড়া)	৫৬	২৪	২০	৪	৪	—	১	৯	—	১১৮
ত্রিপুরা-কুচবিহার	৩	১	—	—	১	—	—	—	—	৫
শ্রীহট্ট	৮	২	—	১	—	—	—	—	—	১১
লন্ডন ও প্যারিস	১	১	১	—	—	—	—	—	—	৩
পাটনা	—	—	—	—	১	—	—	—	—	১
	২৯৩	২৫৮	১৪৪	৪৬	২৬	১০	২৩	২৫	৯	৮৩৪

বাংলা দেশে প্রাচীন হিন্দু-বিজ্ঞানের চর্চা আঠারো-উনিশ শতকে প্রধানত সংস্কৃতের মাধ্যমে প্রচলিত ছিল। পণ্ডিতেরা নিজেদের শিষ্যমণ্ডলীর বাইরে বিজ্ঞানের শিক্ষা-প্রসারের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। ফলে সংস্কৃত শিক্ষা যাঁদের কাছে নিষিদ্ধ ছিল তাঁদের পক্ষে বিজ্ঞানশিক্ষা লাভ করা ছিল খুবই শক্ত ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানশিক্ষা এসময়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয় এবং বিজ্ঞানের বহু বিষয়ের আলোচনা বাংলাভাষার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পেঁছিয়। মনে হয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের অনেকে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান বিষয়ে অবহিত করার জন্য বাংলায় বিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহ আলোচনায় আগ্রহী ছিলেন। তবে তাত্ত্বিক আলোচনার চেয়ে ফলিত বিজ্ঞানের আলোচনাই সাধারণ মানুষের কাছে বেশি প্রিয় ছিল। বৈষ্ণব পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই বিজ্ঞানের তত্ত্বের আলোচনা করেন এবং সকলের বোঝার সুবিধার জন্য তা প্রচার করেন বাংলাভাষার মাধ্যমে। চিকিৎসা, গণিত, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ের প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সুপ্রচলিত ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানশিক্ষা-প্রদানে কোন বড় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ছিল কিনা জানা যায় না। অনুমান করা যায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মধ্যেই এই প্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সীমিত সুযোগের মধ্যেই সাধারণ মানুষ চিকিৎসা, গণিত, কৃষি প্রভৃতি ফলিত বিজ্ঞানকে অনেক উন্নত করে। পণ্ডিত শ্রেণীর মধ্যে বৈদ্যরা সাধারণ মানুষকে রোগ সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। এঁদের আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় চিকিৎসা-শাস্ত্রের বহু পুঁথি রচিত হয়েছিল। বিনষ্ট হবার পর যে সব বিজ্ঞানের পুঁথি আজও সংরক্ষিত আছে তার মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্রের পুঁথির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এই সব পুঁথির সাহায্যেই চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ছাত্রদের রোগলক্ষণ ও রোগপ্রতিরোধ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন। রোগ সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করার প্রয়াসের যে অভাব ছিল না তা এই সকল পুঁথি হতেই বোঝা যায়। অনেক পুঁথি ছিল সংস্কৃত হতে ভাষান্তরিত। আবার অনেক মৌলিক পুঁথিও ছিল। গদ্যের চেয়ে পদ্যের প্রতি অল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষের বেশি আগ্রহ ছিল, তাই বেশির ভাগ বিজ্ঞানের পুঁথি পদ্য বা ছড়ায় লিখিত। তবে কিছু গদ্য পুঁথিও আছে। আবার গদ্যে পদ্যে মিশ্রিত পুঁথিও পাওয়া যায়। গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত অনেকগুলি পুঁথি অনুলিখিত এবং একটি পুঁথির একাধিক নকলও আছে। এগুলির সম্পূর্ণ আলোচনা হলে হয়তো সে যুগের বিজ্ঞানচর্চার ওপর অনেকখানি আলোকপাত হবে এবং তখন বিজ্ঞানচর্চা ছিল কি ছিল না সে সম্বন্ধেও ধারণা করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন পুঁথি থেকে কয়েকটি নমুনা এখানে উদ্ধৃত করা হল।

(১) উদ্ভিদ

প্রথমেতে পুষ্প হয় সব্জী আকৃতি
শুক্লবর্ণ রক্তবর্ণ তার পর হয় তিথি।
বস্তুর আকৃতি দিব্য পুষ্পের ভিতর
তাহার উপরে জীব জনমে বিস্তর।[৫]

বীজ হতে ফুল ও ফলের পরিণতি সম্বন্ধে এমন সহজ সরল ব্যাখ্যা শিশুদের কাছে নিশ্চয়ই খুব চিত্তাকর্ষক ছিল।

(২) চিকিৎসা

"বাই অম্বলের প্রতিকার ঃ সুপারি খণ্ড—সুপারি কাটিয়া জলেতে সিদ্ধ করিব তবে দুগ্ধে সিজাইব শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিব তবে বাকল তোলাইব।"[৬]

ঔষধ প্রস্তুতের এরূপ সরল প্রণালী সকলেই অনুসরণ করতে পারে। সে যুগের বৈদ্যরা এবিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সহজ প্রণালী উদ্ভাবন করতেন এবং সাধারণের কাছে তা সহজবোধ্যভাবে প্রচার করতেন তা অনুমান করা বোধহয় অযৌক্তিক নয়।

(৩) তত্ত্ববিজ্ঞান

"কর্মের পরিচয় ঃ ব্যাপারবৎ কারণের নামকরণ ঃ কারণ জন্য হইয়া কার্যজনক যে হয় তাহার নাম ব্যাপার।"[৭]

বলবিদ্যার কার্য সম্বন্ধে এদেশের সাধারণ মানুষ যে একেবারে অজ্ঞ ছিল না, তা জানা যায় এই সব পুঁথি হতে। বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়ের প্রকাশে বাংলাভাষা যে অক্ষম ছিল না তাও জানা যায় এদের কাছ থেকে।

(৪) জ্যোতিষ

আর এক কথা কহি শুন নরগণ
বাররাসী নবগ্রহ করিএ লিখন।[৮]

রাশি-নক্ষত্রের কথা শুধু পণ্ডিতেরা নয়, সে-সময়ের সাধারণ মানুষও ভালোভাবেই জানত। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষের চর্চা আঠারো শতকেও ভারত তথা বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয় একথা এখন অজানা নয়।

(৫) রসায়ন

কালি প্রস্তুতের ছড়া

লোধ লাহা লোহার গুঁড়ি
গাবের ফল হরিতকী

বাবলা ছাল আঁটির রস
তেলায় কর্য এক আলি
অর্কাঙ্গার যবার কুড়ি
ভৃঙ্গার্জুন আমলকী
ছালিম সেছে করিবে কষ
চারি যুগ না উঠাবে কালি।[৯]

অতি প্রয়োজনীয় এই বস্তুটি যাতে ঘরে ঘরে তৈরি হতে পারে তার জন্য এই প্রণালীটি প্রচারিত হয়েছে। পরীক্ষিত সত্যের ওপর নির্ভর করেই কালির স্থায়িত্বের কথা জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে। অনেক পুঁথিতেই এমন কালি আছে দেখা যায় যা দু'তিনশ বছরের পুরোনো বলে মনে হয় না।

(৬) গণিত-শুভঙ্করের আর্যা

(ক) মাস মাহিনা চার শত
দিন তার পড়ে কত
তঙ্কা প্রতি ষোল গণ্ডা
তাহা করিবে তিন খণ্ডা
এক ঘুচালে থাকে যত
দিন তার পড়ে তত।[১০]

টাকায় ষোল গণ্ডার এক-তৃতীয়াংশ হল $\frac{১}{৩}$। ১৬ হতে $\frac{১}{৩}$ অংশ বাদ দিলে থাকে $\frac{৩২}{৩}$ গণ্ডা অর্থাৎ $\frac{৩২}{৩} \times \frac{১}{২০} \times \frac{১}{১৬}$ টাকা বা $\frac{১}{৩০}$ টা অর্থাৎ মাস মাহিনার $\frac{১}{৩০}$ টা প্রতি দিনে পাবে।

(খ) ন ভাই একাসী গাই
স ভাই দুগ্ধ সমান পাই।[১১]

১	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৮	২	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	৩	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩
৩৪	৩৫	৩৬	৪	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১
৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯
৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৬	৫৫	৫৬	৫৭
৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৭	৬৮	৬৫
৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৮	৭৩
৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৯
৩৬৯	—	—	—	—	—	—	—	—

বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার প্রয়াস যে সেকালে অব্যাহত ছিল তা সহজেই

অনুমেয়। তবে সে যুগের বিজ্ঞানচর্চার সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে বিজ্ঞানের পুঁথিগুলির বিশ্লেষণমূলক আলোচনার প্রয়োজন।

উল্লেখপঞ্জী

১. সেন, সুকুমার : বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান (বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য)-এর ভূমিকা
২. Dharmapal : Science and Technology in Eighteenth Century India
৩. ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন : বাংলা পুঁথির তালিকা-সমন্বয়
৪. মণ্ডল, পঞ্চানন : বাংলা পুঁথি পরিচয়। ১ম খণ্ড, ভূমিকা
৫. বসু, নগেন্দ্রনাথ : সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১ম সং, ১৩০৬, পৃ ৫০
৬. বসু, নগেন্দ্রনাথ : সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১ম, ১৩০৬, পৃ ৫১
৭. ঐ ঐ • ৪র্থ, ১৩০৬, পৃ ৩২৫
৮. Hussain, S. A. (ed.) : Catalogue of Bengali MSS, Abdul Karim's Collection. p. 438
৯. মণ্ডল, পঞ্চানন : বাংলা পুঁথি পরিচয়। ১ম খণ্ড
১০. নামহীন অঙ্কের পুঁথি (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)
১১. ঐ ঐ

আঠারো শতকে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা

আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগের মধ্যে বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে দারুণ বিপর্যয় হয়। দেশীয় ধারায় সুপ্রচলিত ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থা বিনষ্ট হয় এবং তাঁর জায়গায় কোন বিকল্প ব্যবস্থা হয় না, শুধু নিজেদের প্রয়োজনে ইংরেজ সরকার মুষ্টিমেয়র জন্য ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন করে। আর্থিক বঞ্চনায় দেশীয় শিক্ষার ক্রমাবনতি নিরক্ষরতার হারকে দ্রুত বাড়িয়ে তোলে সারা উনিশ শতক ধরে। এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে বিষয়টি গুরুত্ব না পেলেও, পণ্ডিত সুন্দরলাল অনেকদিন আগে এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি তাঁর 'ভারতমে আঙ্গরেজী রাজ' (হিন্দী) বই-এর একটি অধ্যায়ে 'ভারতে শিক্ষার অবলুপ্তি' সম্পর্কে তথা সম্বলিত আলোচনা করেছেন।[১] ১৯২৯ সালে বইটি প্রথম প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ সরকার তা বাজেয়াপ্ত করে। ১৯৩৯ সালে বইটি আবার তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বইটিতে বৃটিশ শাসনের বিস্তৃত পরিচয় দেবার প্রসঙ্গে দেশীয় শিক্ষাকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে তার তথ্য সম্বলিত আলোচনা আছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেককে বইটি অনুপ্রেরণা জোগায়।[২] ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসের লেখক নুরুল্লাও নায়েকও দেশীয় শিক্ষার প্রতি ইংরেজ সরকারের অবহেলার কথা উল্লেখ করেছেন,[৩] তবে অভিযোগটা সরাসরি তীক্ষ্ণভাবে করেন মহাত্মা গান্ধী। ১৯৩১ সালে লণ্ডনে তিনি বলেন যে গত ৫০/১০০ বছরে ভারতে সাক্ষরতার হার অনেক কমে গেছে, এবং এজন্য বৃটিশ সরকারই দায়ী।[৪]

ভারতে শিক্ষা বিস্তারে ইংরেজ সরকারের প্রথম শত বছরের (১৭৫৭-১৮৫৭) ভূমিকার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বৃটিশ ঐতিহাসিকদের মন্তব্যের ওপর নির্ভর করা ঠিক নয়। আঠারো শতকের শেষার্ধে ইংরেজ কোম্পানী সরকার মাত্রাহীনভাবে লুণ্ঠন, অত্যাচার, দেশীয় শিল্প ও শিক্ষার বিনাশ প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করা সত্ত্বেও দেশের শিক্ষার অবস্থা যা ছিল তা ইংলণ্ডের তুলনায় কোন অংশে মন্দ নয়। তৎপরবর্তী শতকে দ্রুত হারে নিরক্ষরতা বৃদ্ধি হয় এবং তার জন্য ইংরেজ সরকার পুরোপুরি দায়ী।

পলাশীর পরে দেশের শিক্ষার হাল কি ছিল তা জানার জন্য প্রাক পলাশী যুগে দেশীয় শিক্ষার রূপ ও প্রকৃতির পরিচয় প্রয়োজন। মুসলমান নবাবদের শাসনকালে বিশেষতঃ মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বকালে গ্রাম বাংলায় শিক্ষার প্রসার ছিল খুব উল্লেখযোগ্য। এ সময় ছোট বড় সব গ্রামেই বিদ্যালয় ছিল

এবং ধনী দরিদ্র সব পরিবারের ছেলেমেয়েরাই পাঠশালায় পড়ার সুযোগ পেত। বাংলার সব নবাবই শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিদ্যানুরাগী মুর্শিদকুলী খাঁ, সুজাউদ্দিন ও আলীবর্দি দেশের বিদ্বৎ সমাজকে বিশেষ সম্মানের আসন দিয়েছিলেন। এঁদের অনুসরণ করে ফৌজদার, জমিদার প্রভৃতিরাও সাধ্যমত শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।[৫] দেশে যেমন ব্যাপক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ছিল, তেমনি উচ্চশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, প্রযুক্তি শিক্ষা এবং শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চাও অবহেলিত ছিল না। মুর্শিদাবাদ ও হুগলীতে ছিল দুটি বড় ইসলামিক শিক্ষাকেন্দ্র। হুগলীর আশেপাশে নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, গুপ্তিপাড়া, ত্রিবেণী, ভাটপাড়া প্রভৃতি জনপদ শিক্ষার পীঠস্থানরূপে ভারতে সর্বত্র পরিচিত ছিল। তাছাড়া ঢাকা, নাটোর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানেও উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। দেশের সর্বত্র ছিল শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ যা নবাবী পীড়ন বা দস্যুর লুণ্ঠনে বিচলিত হয়নি।

ইংলণ্ডে সে সময় গরীব ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ ছিল খুব সীমিত। ওদেশের শিক্ষার রীতিনীতিও ছিল আলাদা। পাঠশালাগুলি সাধারণতঃ চার্চের অধীনে থাকত, তাছাড়া বেতন ভিত্তিক ব্যক্তিগত স্কুলও ছিল। এদেশে সব পাঠশালাই ভূস্বামীর অর্থানুকূল্যে গুরুমশাই ভিত্তিক ছিল, সেখানে ধনী দরিদ্র সব পরিবারের ছেলেমেয়েরাই পড়ার সুযোগ পেত। পাঠশালার জন্য অনুদান দেওয়া জমিদারদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল। গ্রামের জমিদার ও ধনী গৃহস্থরা কলকাতায় চলে আসার আগে পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। গ্রামের জমিদাররা তখন বিদ্যালয়ের জন্য টাকা দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না, বিদ্যালয়গুলির সুষ্ঠু পরিচালনার সঙ্গেও ঘনিষ্টভাবে যুক্ত থাকতেন। দেশের শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন ও সক্রিয় ছিলেন।[৬]

দেশের সে সময়ের শিক্ষাধারা সমাজের প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হত। এই শিক্ষা ব্যবস্থার তিনটি স্তর ছিল। (১) হিন্দু শিশুদের পাঠশালায় ও মুসলমান শিশুদের তোলবখানায় প্রাথমিক শিক্ষা, (২) মক্তব ও মাদ্রাসার মাধ্যমে মুসলমান ছাত্রদের এবং টোল ও চতুষ্পাঠীর মাধ্যমে হিন্দু ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা এবং (৩) পারিবারিক পরিবেশে সাংসারিক, সামাজিক, বৃত্তি-মূলক কর্মশিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষা। তাছাড়া বাংলার সর্বত্র ব্যাপক হারে লোকশিক্ষার (শ্রুতি-দৃশ্য মাধ্যমে) প্রচলন ছিল।

গ্রামের পাঠশালাতে ও তোলবখানায় শতকরা আশী ভাগ বালকবালিকার পড়া শেষ হত। এখানে তারা অক্ষর পরিচয়, সরল পঠন, হস্তলিপি, গণনা ও আঁক কষা, সরল হিসাব, পত্র লিখন প্রভৃতি শিখত। গ্রাম্য সমাজের দায়দায়িত্ব পালনের উপযোগী ছিল এই শিক্ষা ব্যবস্থা। দেশীয় প্রাথমিক

শিক্ষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল মৌখিক শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের স্মৃতিশক্তি বাড়াবার প্রয়াস। এই পদ্ধতি ছিল বিশেষ জনপ্রিয়। কবিতা, ছড়া, নীতিশিক্ষা, কথিকা প্রভৃতি মুখে মুখে বলা অভ্যাস করানো হত। বিজ্ঞান, বৃত্তিশিক্ষা, চাষবাষের হিসাব প্রভৃতিও ছড়ার সাহায্যে মুখে মুখে শেখানো হত।[৭] মুখে মুখে অঙ্ক শেখানোর পদ্ধতি আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল এবং আঠারো শতকে এই পদ্ধতির উন্নতি ও প্রসার হয়। শুভঙ্করের আর্যা সারা দেশে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। তাছাড়া অঙ্ক শেখানোর জন্য পাথরের নুড়ি, ঝিনুক প্রভৃতিও ব্যবহৃত হত বিভিন্ন জায়গায়।[৮] আঁক কষানোর মত চিঠি লেখা শেখানো হত বিশেষ যত্ন করে।

উনিশ শতকের গোড়ায় শ্রীরামপুরের মিশনারীরা বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের জন্য। তাঁরা এই দেশীয় শিক্ষা সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। অন্যতম মিশনারী উইলিয়াম ওয়ার্ড তাঁর "হিন্দুজ..." নামে চার খণ্ডে সংকলিত গ্রন্থে তাঁদের পর্যবেক্ষণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি লেখেন, "বাংলার প্রায় সব বড় গ্রামেই পাঠশালা আছে। সেখানে শিশুদের লিখতে, পড়তে আর অঙ্ক কষতে শেখানো হয়। শিশুদের অক্ষর পরিচয় হয় লিখে ও পড়ে। পাঁচ বছরে শিশু পাঠশালায় যায়। প্রথমে সে খড়ি দিয়ে মেঝেতে অক্ষর লেখে, তারপর শরের কলম দিয়ে তালপাতার ওপর লেখে এবং শেষে লেখে কলাপাতার ওপর। প্রথমে লেখে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। পরে যুক্তাক্ষর, তারপর মানুষ, গ্রাম, পশুপাখী প্রভৃতির নাম। সবশেষে তাকে লিখতে হয় সংখ্যা। যখন শিশুরা তালপাতার শ্রেণীতে থাকে তখন প্রতিদিন দুবার করে উঠে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে ধারাপাত পড়ে। একটি বয়স্ক ছাত্র এই পাঠে নেতৃত্ব দেয়। ধারাপাতে কড়া সারণী থেকে পর পর গণ্ডা, বুড়ি, পণ, কাহনের সারণী তারা উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করে। তালপাতায় লেখার সময় ঐগুলি দাগ দিয়ে লেখে এবং বলে দেয় কোন্‌টি কি। তারপর তারা যোগের সারণী লেখে এবং এক থেকে একশ পর্যন্ত গুণতে শেখে। এগুলি শেখার পর কচি কলাপাতায় আঁক কষে এবং মাপ ও পরিমাপের একক ব্যবহার করতে শেখে। রতি থেকে মণ পর্যন্ত সব ভাগের সঙ্গে পরিচিত হয়। চিঠি ও দলিলপত্র লেখাও এই সঙ্গে তাদের শেখানো হয়। গ্রামের পাঠশালা সাধারণতঃ খুব সকালে বসে, এবং চলে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত। মধ্যাহ্ন আহারের ছুটির পর বিকাল তিনটায় আবার বিদ্যালয় বসে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক গ্রামবাসীর কাছে খুব সম্মানীয় ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর বেতন খুব অল্প। কোন ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সময় গুরুমশাইকে সিধা (চাল, আলু প্রভৃতি) দেয় এবং প্রতি মাসে বেতন দেয়

তিন পয়সা। তালপাতার শ্রেণীতে উঠলে সে বেতন দেয় ছ'পয়সা এবং আরও উঁচু শ্রেণীতে উঠলে আট থেকে বারো পয়সা পর্যন্ত বেতন দেয়।[৯]

বড় সব গ্রামে যেমন পাঠশালা ছিল তেমনি দু'তিনটি ছোট গ্রাম মিলেও একটা করে পাঠশালা ছিল। সব শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা এখানে পড়ার সুযোগ পেত। ৭।৮ বছর পর্যন্ত মেয়েদের পড়ার সুযোগ ছিল অর্থাৎ সাক্ষরতা লাভ করার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হত না। এরপর পারিবারিক পরিবেশে তারা সামাজিক ও ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করত।

পাঠশালাগুলি সাধারণতঃ গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ বা নাটমন্দিরে বসত। উৎসব অনুষ্ঠান, যাত্রাগান, কথকতা প্রভৃতির জন্য জমিদারেরা সাধারণতঃ প্রতি গ্রামেই চণ্ডীমণ্ডপ বা মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দির তৈরী করে দিতেন। গ্রাম্য পাঠশালার জন্য এই সব স্থান নির্দিষ্ট ছিল। জমিদারেরা বা ধনী-গৃহস্থ প্রয়োজন হলে পাঠশালার জন্য নিজেদের বাড়ীর এক অংশ ছেড়ে দিতেন। আবহাওয়া ভালো থাকলে অনেক সময় বাগানে গাছের তলাতেও পাঠশালা বসত।

ইংরেজ রাজত্ব শুরু হবার আগে জমিদার ও ধনী গৃহস্থরাই পাঠশালার ব্যয়ভার বহন করতেন এবং শিক্ষার্থীদের কোন মাহিনা দিতে হত না। ফলে গরীব কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী পরিবারের ছেলেমেয়েরা পাঠশালায় পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সরকারী নথিপত্রে দেখা যায় যে আঠারো শতকে যে প্রথা চালু ছিল তাতে খাজনার একটা অংশ প্রজাদের শিক্ষা ও চিকিৎসাদির জন্য নির্দিষ্ট ছিল, যেমন ছিল আরক্ষা ও জলসেচের জন্য। আবার অনেক স্থলে শিক্ষা ও চিকিৎসাদির পরিচালনার জন্য নিষ্কর জমি দান করা হয়েছে, যেমন দান করা হয়েছে মঠ, মন্দির, মসজিদ প্রভৃতি ধর্মীয় কেন্দ্রগুলি পরিচালনার জন্য। তাছাড়া পণ্ডিত, সভাকবি, সাধুসজ্জন, গুরুমশাই প্রভৃতিদেরও নিষ্কর জমি দান করা হত। ১৭৭৮ সালে ইংরেজ কোম্পানী সরকার দেখে দেশের প্রায় অর্ধেক জমিই এইভাবে বিলি করা আছে। ইংরেজ সরকার এই সব জমির খাজনা বাড়িয়ে দেয়।[১০] ইংরেজ সরকারের রাজত্বকালে ছাত্রদের বেতন দেবার প্রথা চালু হলে গরীবরা আর ছেলেমেয়েদের পাঠশালায় পাঠাতে পারে না।

পাঠশালা ছাড়া তোলবখানা[১১] নামে মুসলমান বালকদের জন্য যে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল তার অবস্থাও পাঠশালার মত। বাংলার সর্বত্র তোলবখানা ছিল এবং ধনী মুসলমানদের দানে সেগুলি পরিচালিত হত।

সরল গ্রামীণ জীবনের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের সব ছেলে-মেয়েই পেত এবং এখানেই অধিকাংশের (শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ) লেখাপড়া শেষ হত।[১২] মুষ্টিমেয় কয়েকজন শুধু উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করত।

কিন্তু সকলের জন্য লোকশিক্ষার প্রসার ছিল ব্যাপক ! বড়লোকের বাড়ীতে অথবা গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে নিয়মিতভাবে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবৎ, পুরাণ প্রভৃতি পাঠ এবং পাঁচালী, কথকতা, লোকগীতি, পল্লীগীতি প্রভৃতির অনুষ্ঠান হত। এসবে যোগ দেওয়া গ্রামের মানুষের নিয়মিত অভ্যাসের মধ্যে ছিল। ইংরেজ প্রভুত্বের আগে বাংলার গ্রামের সুস্থ পরিবেশ লোকশিক্ষার মাধ্যমে বাঙ্গালীর উন্নত মননশীলতা গঠন করে। এর পুষ্টি সাধন করত একদল ভ্রাম্যমান লোকশিক্ষক। এঁরা হলেন ফকীর, সুফী, দরবেশ, সাধু, সন্ন্যাসী, আউল, বাউল, সহজিয়া বৈষ্ণব, কর্তাভজা, বৈরাগী ইত্যাদি, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বাংলার সাধারণ মানুষকে এঁরা লোকধর্ম, ন্যায়অন্যায়, সামাজিক রীতিনীতি, অর্থনৈতিক বিষয় প্রভৃতি শিক্ষা আনন্দঘন পরিবেশে দিতেন।

১৭৫৭-এর আগে বাংলায় নিরক্ষরতার হার যেমন বেশী ছিল না তেমনি দৃশ্য-শ্রুতির মাধ্যমে লোকশিক্ষা সাধারণ মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকারেও রাখেনি। এই শিক্ষা মানুষকে কষ্টসহিষ্ণু, স্বল্পে সন্তুষ্ট ও ধর্মনির্ভরশীল করে। তেমনি বাইরের জগৎ সম্বন্ধে থাকে অনাগ্রহী, গ্রাম বা অঞ্চলের বাইরে কি ঘট্‌ছে সে সম্বন্ধে গ্রামের মানুষের কৌতূহল ছিল না। দেশের অস্থিরতা, অশান্তি বা রাজনৈতিক পট পরিবর্তন গ্রামের মানুষকে উদ্বেলিত করে নি, এই শিক্ষা দেশের মানুষের প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সচেতনার সৃষ্টি করেনি। যখন ধাক্কা এসেছে তখন বাধা দেবার জন্য এগিয়ে না গিয়ে নিজেদের আরও গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে। ১৭৫৭-এর পর নবাবের প্রতিভূ ও কোম্পানীর কর্মচারীরা গ্রামবাসীদের ওপর যখন প্রচণ্ড অত্যাচার করতে থাকে, জমিদারদের ওপর টাকার জন্য প্রচণ্ড চাপ পড়ে তখন রুখে দাঁড়াবার চেতনার অভাব দেখা যায় এদের মধ্যে।

উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা হিন্দু ও মুসলমানদের সম্পূর্ণ পৃথক ছিল নবাবী আমলে। উভয় সম্প্রদায়েরই শিক্ষা ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। উভয় সম্প্রদায়েরই উচ্চ শিক্ষা পরিচালিত হত ধর্মের অনুশাসনের নিয়ন্ত্রণে। মুসলমানেরা আরবী-ফার্সীর মাধ্যমে পেত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা আর হিন্দুরা সংস্কৃতের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের শিক্ষা। প্রশাসন ও ব্যবসায়িক কাজকর্ম পরিচালিত হত আরবী ফার্সীর মাধ্যমে। অভিজাত ধনী হিন্দুরা প্রায় সকলেই কাজের সুবিধার জন্য আরবী ফার্সী শিখতেন।

মুসলমান প্রধান অঞ্চলে ছিল মক্তব ও মাদ্রাসা। নবাব, আমীর, ধনী মুসলমানেরা ইসলামী শিক্ষার জন্য উদার হয়ে দান করতেন। মক্তব মাদ্রাসার শিক্ষকেরা আখুনজী নামে পরিচিত হতেন।[১৩] এঁরা আরবী, ফার্সী, উর্দু প্রভৃতি ভাষা শেখাতেন এবং সেই সঙ্গে শেখাতেন ইসলামী ধর্মশাস্ত্র, সামাজিক রীতিনীতি, হিসাবাদি প্রভৃতি। এখানে সাধারণতঃ অভিজাত ও

ধনী মুসলমান বালকেরা পড়ার সুযোগ পেত। তোলবখানার ওপরে গরীবদের পড়ার সুযোগ ছিল না। গরীব বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে খুব অল্প লোকই আরবী ফার্সী জানত। ১৭৯৩ সালে কলকাতার মানিকতলায় গরীব মুসলমানদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করার সময় কেরী জানতে পারেন যে তাঁরা বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানে না।[১৪] মক্তবে ছাত্ররা তালপাতা ছাড়া দেশী কাগজ ও কালী ব্যবহার করত। মাদ্রাসার উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ শুধু যোগ্য ছাত্ররা পেত। এখানে ছাত্ররা বিনা খরচে আহার, বাসস্থান ও পড়ার সুযোগ পেত। মাদ্রাসা সাধারণতঃ মসজিদ ও ইমামবাড়ার সঙ্গে যুক্ত থাকত। বড় নগর ও জনপদে থাকত মাদ্রাসা এবং পরিচালিত হত সরকারি অনুদানে। এখানে লেখাপড়া শিখে ছাত্ররা সরকারের বিচার ও প্রশাসন বিভাগে উচ্চপদে চাকুরী লাভ করত। মাদ্রাসায় ধর্মশাস্ত্র ছাড়া আইন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হত। বাংলায় নবাবী শাসন থাকায় মাদ্রাসা শিক্ষার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। তাছাড়া বহির্ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বলে ইসলামী শিক্ষায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশের দ্বার একেবারে রুদ্ধ ছিল না। ইংরেজরা এদেশে আসার পরও দেখা যায় ইসলামী শিক্ষা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ধারণায় পুষ্ট হয়েছে। যেমন, ১৭৮৭ সালে কলকাতায় মুসলমান মনীষী তোফাজ্জল হোসেন খাঁ নিউটনের প্রিন্সিপিয়া ল্যাতিন থেকে ফার্সীতে অনুবাদ করেন।[১৫] মুসলমান রাজশক্তি ক্ষমতাচ্যুত হবার পর বাংলায় ইসলামী শিক্ষার অবনতি হয়। তবু ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে প্রশাসন, বিচার ও ব্যবসাবাণিজ্যের কাজের জন্য আরবী ফার্সী ভাষার শিক্ষা কিছুটা অব্যাহত ছিল। ইংরেজ সিভিলিয়ানরা মুন্সী নিয়োগ করে আরবী ফার্সী শিখতেন এবং ইংলণ্ডেও ফার্সী শেখার ব্যবস্থা হয়। উনিশ শতকের গোড়ায় কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সিভিলিয়ানদের আরবী ফার্সী শিক্ষার ব্যবস্থা করে। কিন্তু দেশীয়দের মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হয়। মাদ্রাসাগুলির আর্থিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যায় এবং এদের আধুনিকীকরণেরও কোন চেষ্টা হয় না।

হিন্দুদের উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি প্রভৃতি সব শাস্ত্রই সংস্কৃতের মাধ্যমে পড়াবার বন্দোবস্ত টোলে ছিল। এই শিক্ষা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল সীমিত। বাংলায় সংস্কৃত জানা লোকের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। সংস্কৃত শিক্ষার ধারক বাহক ছিলেন হিন্দু রাজা ও জমিদারেরা। এঁদের সকলের জমিদারীতে টোল ও চতুষ্পাঠী ছিল যাদের ব্যয়ভার তাঁরা বহন করতেন। এ যুগের সংস্কৃত পণ্ডিত ও অধ্যাপকরা জাগতিক ভোগসুখের স্পৃহা থেকে বিমুক্ত ছিলেন। অধ্যাপনা, শাস্ত্রচর্চা ও

গ্রন্হ রচনার মধ্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এঁদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। কিন্তু দরিদ্র হলেও সমাজে তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধেয়। ধনী জমিদার ও ব্যবসায়ীরাও অধ্যাপকদের বিশেষ সম্মান দিতেন।

বর্ণশ্রেষ্ঠ হিন্দু বালকরা পাঁচ বছর বয়স থেকেই চতুষ্পাঠীতে পড়ার সুযোগে পেত। এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের বিদ্যারম্ভ হত। প্রথমে বর্ণ পরিচয়, তারপর একে একে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র পাঠ করত তারা। আঠারো শতকে বাংলার সব নগরে এবং অনেক বড় গ্রামে চতুষ্পাঠী ছিল। বর্ধমান, নাটোর, নবদ্বীপ, ঢাকা, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের চতুষ্পাঠীতে বাংলার বাইরে থেকেও ছাত্র আসত অধ্যয়ন করতে।[১৬]

চতুষ্পাঠীর শিক্ষা শেষ হলে যোগ্য ছাত্ররা উচ্চতর শিক্ষার জন্য টোলে প্রবেশ করত। টোলগুলি ছিল বর্তমান কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের মত। নবদ্বীপের টোলগুলি দেখে অনেক ইংরেজ পণ্ডিত নবদ্বীপকে বাংলার অক্সফোর্ড আখ্যা দেন। নবদ্বীপ ছাড়া বিখ্যাত টোল ছিল ভাটপাড়া, বর্ধমান, ত্রিবেণী, বালী, রাজনগর (ঢাকা), বিষ্ণুপুর, নাটোর প্রভৃতি স্থানে। বিভিন্ন শাস্ত্রের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন স্থান বিখ্যাত ছিল। ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ, বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি এখানে ন্যায় শাস্ত্রচর্চার একটি ঐতিহ্য গড়ে তোলেন। কোন ছাত্র দীর্ঘকাল ঐ শাস্ত্রপাঠ করে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করতেন। অনেকে আবার বাংলাদেশে পাঠ শেষ করে মিথিলা কিংবা কাশীতে উচ্চতর শিক্ষার জন্য গমন করতেন। শিক্ষান্তে ছাত্ররা সাধারণত গ্রামে ফিরে গিয়ে অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করতেন।

বিভিন্ন পেশার বৃত্তিশিক্ষা বা কারিগরীবিদ্যা প্রশিক্ষণের কোন শিক্ষায়তন ছিল না। জাতি হিসাবে পেশা নির্ধারিত থাকায় পারিবারিক পরিবেশেই প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রচলিত ছিল। তাছাড়া কুশলী কারিগর সাধারণতঃ তাঁর সহকারীদের কাজ শেখাতেন। বাংলার জগদ্বিখ্যাত কুটিরশিল্প সে-সময় ছিল উন্নত ও সুপ্রসারিত এবং ভারতের রপ্তানী দ্রব্যের তালিকায় ছিল অগ্রভাগে।

আঠারো শতকে ভারতের শিক্ষা বিষয়ক অনুসন্ধান থেকে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। প্রচলিত ধারণা জানায় যে গরীব নিম্ন-বর্ণের মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বিশেষ ছিল না, কিন্তু এই তথ্য থেকে দেখা যায় ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে শ্রমজীবী, কৃষিজীবী এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণের গরীব মানুষের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার হার কম ছিল না। শিক্ষার আলো থেকে তাদের যে বঞ্চিত করা হত না তার তথ্য সংগ্রহ করে ধরমপাল

দেখিয়েছেন বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রাহ্মণ বৈদ্যদের চেয়ে শূদ্রদের সাক্ষরতার হার বেশী ছিল।[১৭] সে-সময় রাজা জমিদারের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতেন বলে সমাজের দরিদ্রতম পরিবারের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষালাভের বাধা ছিল না। এদের অনেকে গ্রাম থেকে এসে ইংরেজদের অধীনে নানা কাজে যোগ দিতেন। একেবারে শিক্ষাবিহীন হলে একাজে সহজে তাঁরা যোগ দিতে পারতেন না।

সাম্রাজ্যলোভী ইংরেজ সরকার ভারতে তাদের শোষণ ও শাসন কায়েম করতে সুপরিকল্পিতভাবে দেশীয় শিল্প ও শিক্ষাকে ধ্বংস করে, গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভেঙ্গে গ্রামের দারিদ্র্য শতগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং দেশের বিত্ত ও প্রতিভাকে টেনে নিয়ে আনে সহরে। ইংরেজ সরকার একটি নতুন শ্রেণীর মানুষের জন্ম দেয় যাদের শেখায় ইংরেজকে তোষণ আর দেশকে ঘৃণা করতে। বৃটিশ শক্তির ভিত সুদৃঢ় করতে তিনভাবে কোম্পানী সরকার অগ্রসর হয়। (১) ক্রমবর্ধমান বৃটিশ শক্তির প্রশাসনিক দায়দায়িত্বের জন্য দেশীয় আইন-কানুন, রীতিনীতি, ভাষা ইত্যাদি জানবার জন্য ইংরেজ রাজপুরুষেরা বিশেষ সচেষ্ট হন। (২) বৃটিশ রাজনীতিবিদরা মনে করেন উচ্চস্তরের প্রাচ্য জ্ঞানের অবলুপ্তি পাশ্চাত্য দেশকে ঐ জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করবে। তাই প্রাচ্য চর্চার (ইংরেজ রাজপুরুষদের) প্রতি মনোযোগ দেন। (৩) দেশীয়দের মধ্য থেকে ইংরেজী ধারার প্রতি অনুগত একটি সম্প্রদায় গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। কোম্পানীর সব প্রয়াসই বৃটিশ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশে পরিচালিত হয়, এদেশের কল্যাণের জন্য নয় এবং এই প্রয়াসের প্রভাবে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও কলকাতার বাবু সমাজ তৈরী হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভাঙ্গাগড়ার এই প্রবণতা অনুধাবন করে মহামনীষী কার্ল মার্কস ১৮৫৩ সালে লিখেছেন, "England had to fulfil double mission in India, one destructive, the other regenerating— the anihilation of old Asiatic society and laying of the material formation of the western society in India."[১৮] উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে বাংলাদেশের শিক্ষার গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে সরকারের এই মনোভাব।

আঠারো শতকের প্রথমার্ধে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার, লুণ্ঠন প্রভৃতি দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। শিক্ষার বিকাশ এসময়ে ছিল অব্যাহত। শিক্ষার ওপর আঘাত আসার সুরু হয় পলাশীর যুদ্ধের পর। বিশেষ করে ১৭৬৫ সালে কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করলে। ১৭৭০-এর মন্বন্তর ও ১৭৯২-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার ভাঙ্গন সুরু হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে

এরূপ বিপর্যস্ত অবস্থায় উনিশ শতকের সূচনা হয় এবং এই অবস্থার চিত্র শিক্ষাবিষয়ক নানা অনুসন্ধানের বিবরণীতে দেখা যায়।

আঠারো শতকের শেষের দিক থেকেই এদেশে ইউরোপীয়দের জন্য ইংরেজী শিক্ষার স্কুল তৈরী হতে সুরু হয়। দেশীয়দের এখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। তবু ব্যক্তিগত চেষ্টায় দেশীয়দের অনেকে ইংরেজী ভাষা শেখেন ইংরেজদের সঙ্গে কাজ করার সুবিধার জন্য। মিশনারী উইলিয়াম কেরী ও জন এলারটনের আগে দেশীয়দের নতুনধারায় শিক্ষা দেবার কথা কেউ ভাবেননি। ১৭৯৪ সালে কেরী উত্তরবঙ্গের মদনাবতীতে এবং এলারটন গোমালতীতে দেশীয়দের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উনিশ শতকের গোড়ায় কেরী শ্রীরামপুরে এসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যধারা সংমিশ্রণে এবং বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করেন। বাংলায় আধুনিক শিক্ষার সূচনা হয় শ্রীরামপুরে।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে বিপর্যস্ত ও ক্রমহ্রাসমান দেশীয় শিক্ষার কিরূপ অবস্থা ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় সরকারী ও বেসরকারী নিম্নলিখিত তথ্যানুসন্ধানের বিবরণ থেকে ঃ—

(১) জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অনুসন্ধান বিবরণ (১৮০১-১৮০২)
(২) ডঃ বুকাননের অনুসন্ধান বিবরণ (১৮০৭-১৮১৪)
(৩) উইলিয়াওয়ার্ড ও শ্রীরামপুর মিশনারীদের বিবরণ (১৮০৭-১৮১৬)
(৪) উইলিয়াম এ্যাডামের বিবরণ (১৮৩৫-৩৮)

অনুসন্ধানকারীরা সকলে ইংরেজ এবং তাঁরা যখন নিজেদের দেশে ছেড়ে আসেন তখন তাঁদের দেশের শিক্ষার অবস্থা এদেশের চেয়ে ভালো ছিল না। ধরমপাল এ সম্পর্কে বলেছেন, "……in terms of content and proportion of those attending Institutions and Schools, the situation in India in 1800 do not in any sense look inferior to what obtained in England then and in many respects Indian schorling seems to have been much more extensive."[১৯] পূর্বোক্ত অনুসন্ধানের (ওয়ার্ডের ছাড়া) কোনটারই নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্দেশ্য ছিল না। এই অনুসন্ধানের কি সার্থকতা তা জানা যায় না।

প্রথম অনুসন্ধানটি হয় ১৮০২ সালে, গভর্নরের জেনারেলের আদেশে সব জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চল্লিশটি প্রশ্নের উত্তর চেয়ে পাঠানো হয়।[২০] এই প্রশ্নগুলির মধ্যে ১৪নং-এর প্রশ্নটি ছিল নিম্নরূপ, "Are there any private schools or seminaries under your jurisdiction in which Hindu and Mahamedan law is taught and how are these Institutions maintained ?"[২১] প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগের কাজের

জন্য হিন্দু ও মুসলমানদের আইন জানা দরকার, সেজন্য গভর্নর জেনারেল আইন শিক্ষার খোঁজ নেন। খুবই তাৎপর্যের ব্যাপার সব জেলা ম্যাজিস্ট্রেটই প্রাথমিক শিক্ষার তথ্য সরবরাহ করেন। ১৮০১-০২ সালে গৃহীত তাঁদের প্রেরিত তথ্য* থেকে জানা যায় যে এই প্রদেশের সর্বত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছড়াছড়ি ছিল এবং এইসব বিদ্যালয়ে পড়া, লেখা ও আঁক কষা শেখানো হত, অর্থাৎ কোম্পানীর অপশাসন ও পীড়ন, মন্বন্তর, কলকাতার বাবুদের জমিদারী লাভ প্রভৃতি দ্বারা **গ্রামসমাজের আর্থিক বিপর্যয় সত্ত্বেও দেশের নিরক্ষরতার হার তখনও বাড়েনি।** ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে এই বিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ গরীব জনসাধারণের জন্য ছিল। অভিজাত ধনীরা সাধারণতঃ বাড়ীতে গৃহশিক্ষক রেখে তাঁদের সন্তানদের লেখাপড়া শেখাতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকটি ধনী পরিবার একত্রে সমবায় প্রথায় গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করতেন। অনেক স্থলে (যেখানে জমিদারের অনুদান বন্ধ হয়ে যেত) ছাত্রদের মাসিক দুই আনা (বর্তমান ১২ পয়সা) হিসাবে বেতন দিতে হত। এই বিবরণ থেকে আরও জানা যায় যে অনেক স্থলে গুরুমশাই নিষ্কর জমি পেতেন বা অন্যান্য প্রকৃতির অনুদান পেতেন।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের এই রিপোর্ট কোম্পানীর কর্তাদের বিশেষ মনঃপূত হয়নি, তাই নানা খুঁত বার করে রিপোর্টগুলিকে নির্ভরযোগ্য নয় বলে কোম্পানী প্রচার করে। দেশের শিক্ষার অবস্থা কোম্পানীর সাহায্য ছাড়াই যদি ভালো থাকতে দেখা যায়, তবে এ দেশের সবকিছুই খারাপ, ইংরেজরা এ দেশের ভালো করছে এ-প্রচার কোন জোর পাবে না। কোম্পানীর ডিরেক্টররা ফ্রান্সিস বুকাননকে শিক্ষার অবস্থান সম্পর্কে অনুসন্ধানের ভার দেন। ১৮০৭-১৪-এর মধ্যে অনুসন্ধান করে বুকানন একটি রিপোর্ট পেশ করেন।[২২] বুকাননের রিপোর্ট থেকে জানা যায় দেশে দু'ধরনের বিদ্যালয় ছিল। একটি সাধারণ পাঠশালা, অপরটি ব্যক্তিনিয়ন্ত্রিত সংরক্ষিত পাঠশালা। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বলা হত গুরু, তাঁরা যে কোন জাতের হত। গুরুরা খুব গরীব হতেন এবং সমাজে তাঁদের কোন মর্যাদা ছিল না। পাঠশালাগুলি সরকারি বা জমিদারের অনুদান পেত না এবং গুরুমশাইদের পুরোপুরি ছাত্রদের বেতনের ওপর নির্ভর করতে হত। নগরাঞ্চলে ছাত্রদের বেতন ছিল মাসিক চার আনা থেকে আট আনার মধ্যে। সাধারণত একজন গুরুমশাই-এর কাছে ২০ জন বালকবালিকা পড়ত। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল কম এবং সেখানে ছাত্রদের মাসিক বেতন চার আনার বেশী ছিল না। গ্রামের চাষী মজুররা এতোই গরীব ছিল যে তারা গুরুমশাইকে মাইনে দিতে পারত না বলে তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠশালায় যাবার সুযোগ ছিল না। তবে

---

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

অনেক পরিবারে লেখাপড়া শেখানোর আগ্রহ এতো বেশী ছিল যে বাপ-মায়েরা অনেক কষ্ট সহ্য করেও ছেলেমেয়েদের পাঠশালায় পাঠাত। গরীব গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি এই আগ্রহ বুকাননকে বিস্মিত করে।[২৩] বুকাননের হিসাব অনুযায়ী সে-সময় দিনাজপুর জেলায় সাক্ষরতার হার ছিল ১২·৫%। তবে তাঁর অনুসন্ধানের সূত্র না জানায় এই অনুসন্ধানের পরিসংখ্যন গ্রহণযোগ্য কিনা বলা যায় না। বিশেষ করে পূর্ববর্তী সময়ে গ্রামের যে শিক্ষার পরিবেশ ছিল তাতে এত কম সাক্ষরতার হার হবার কথা নয়। তবে যে হারে মানুষের দারিদ্র্য বাড়ছিল তাতে লেখাপড়া শেখার সুযোগও কমে গিয়েছিল দুএক দশকের মধ্যে।

দেশীয় শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে এই সরকারি অনুসন্ধানের পেছনে শিক্ষার উন্নতি করার কোন সদিচ্ছা ছিল না। মনে হয় দেশের অজ্ঞতার কথা প্রচার করার উদ্দেশেই এই সরকারি অনুসন্ধান হয়েছিল। দেশীয় শিক্ষার ব্যবস্থার পুনর্গঠন, উন্নতি ও প্রসারের উদ্দেশে প্রথম অনুসন্ধান করেন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা (১৮০৭-১৬)। এই অনুসন্ধানের সঙ্গে ছিল নতুন ধারায় দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিদ্যালয় গড়ার পরিকল্পনা। জন ক্লার্ক মার্শম্যান শ্রীরামপুরের Hints relative to native education সম্বন্ধে লিখেছেন, "Dr. Marshman's scheme is the first organised plan for the establishment of schools which had ever been deviced in India."[২৪] এঁদের বিবরণীতে দেশীয় বিদ্যালয়ের আর্থিক করুণ অবস্থা বিশেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শ্রীরামপুর মিশন ১৮১৬ সাল থেকে বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নতুন ধারায় দেশীয় বিদ্যালয় স্থাপন করা সুরু করে। ইতিপূর্বে অপর একজন মিশনারী রবার্ট মে চুঁচুড়া অঞ্চলে অনুরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলকাতা ও তার চতুষ্পার্শবস্থ এলাকায় উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে পাশ্চাত্য ধারার অনুকরণে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্হাপিত হতে থাকে এবং গ্রামাঞ্চলের প্রতি অবহেলা ও উপেক্ষা বাড়তে থাকে।

দেশীয় শিক্ষা সম্বন্ধে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর অনুসন্ধান অনুষ্ঠিত হয় ১৮৩৫-৩৮ সালে। ইংরেজ সরকারের পক্ষে তা অনুসন্ধান করেন উইলিয়াম এ্যাডাম। এর পেছনেও প্রাথমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের কোন পরিকল্পনা ছিল না। এই রিপোর্টে দেশীয় শিক্ষার করুণ চিত্রটি ফুটে উঠেছে, তেমনি বিদেশী সরকারের দেশকে নিরক্ষর করার প্রচেষ্টার রূপটাও ঢাকা থাকেনি। সবচেয়ে বিস্ময়কর তথ্য হল দীর্ঘ ৮০ বছর ধরে নিপীড়ন, উপেক্ষা, অবহেলা ও আর্থিক বঞ্চনা করেও ইংরেজ সরকার গ্রাম বাংলায় শিক্ষার ব্যাপকতা কমাতে পারেনি। এ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে লেখেন, "that there seemed to exist 100,000 village schools in Bengal and Bihar around

1830."[২৫] এ্যাডামের রিপোর্টে সরকার চমকে ওঠে, সোরগোল তুলে বলে এ রিপোর্ট নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু সরকার যতই চীৎকার করুক পরবর্তী-কালে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে উনিশ শতকে দেশে নিরক্ষরতা অনেক বেড়েছে। আঠারো শতকের শেষে ইংলণ্ডের তুলনায় এদেশে সাক্ষরতার বেশী ছিল, কারণ তখন ওদেশে গরীবদের শিক্ষার সুযোগ ছিল খুব সীমিত।[২৬] আর উনিশ শতকে ওদেশে সাক্ষরতার হার বাড়ে দ্রুতগতিতে এবং সেই গতিতে এদেশে সাক্ষরতা কমে। এ্যাডামের সিদ্ধান্ত থেকে জানা যায় যে ঃ—

(১) বাংলার প্রতি গ্রামে অন্ততঃ একটি করে বিদ্যালয় ছিল।

(২) বাংলা ও বিহারের গ্রাম সংখ্যা ১,৫০,৭৪৮ এবং এখানে ১ লক্ষের মত বিদ্যালয় ছিল।

(৩) প্রতি জেলায় অন্ততঃ ১০০টি করে উচ্চ শিক্ষায়তন ছিল এবং ১৮টি জেলায় ১৮০০ শিক্ষায়তনে কমপক্ষে ১০,০০০ শিক্ষার্থী ছিল।

(৪) সর্বস্তরের ও সর্বশ্রেণীর মানুষ শিক্ষার সুযোগ পেত।

উনিশ শতকের শেষের দিক থেকেই ভারতের জাতীয় মনীষীরা উপলব্ধি করেন কিভাবে ব্রিটিশ সরকার এদেশকে শিক্ষাশূন্য ও শিল্পশূন্য করেছে। জাতীয় আন্দোলনের সূচনায় অনেকেই ব্রিটিশ অপশাসনের এই দিকটি বিশেষভাবে তুলে ধরেন। সবচেয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরেন মহাত্মা গান্ধীজী। ১৯৩১ সালের ২০শে অক্টোবর লণ্ডনের রয়্যাল ইনিষ্টিটিউট অফ ইণ্টার-ন্যাশন্যাল এ্যাফেয়ার্সে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিষয়টি উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্যের মূল দুটি বিষয় ছিল (১) ৫০ বা ১০০ বছর আগে যা ছিল এখন ভারতে তার চেয়ে বেশী নিরক্ষর। (২) ইংরেজ সরকার দেশের শিক্ষাকে সংরক্ষণ ও প্রসার করা দূরে থাকুক, তারা এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যাতে দেশের শিক্ষা নষ্ট হয়ে যায়। শিক্ষারূপ বৃক্ষের তারা মূল উৎপাটন করে, আর সেই সুন্দর বৃক্ষটি শুকিয়ে যায়।[২৭]

প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে আঠারো শতকের অবস্থা বিশেষ উৎসাহ ব্যঞ্জক ছিল না। বৈদিক যুগে স্ত্রীশিক্ষা ছিল আবশ্যিক। তারপর দেশের রাজনৈতিক পরিবেশের উত্থান ও পতনের সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। বহু উদাহরণ আছে যা দ্বারা জানা যায় যে, বৈদিক যুগে শিক্ষালাভে স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার ছিল এবং স্ত্রীপুরুষ উভয়ের সমান সামাজিক সুবিধা ভোগ করত। এ সময় পুরুষের সঙ্গে নারী সমানভাবে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করত।[২৮] পরবর্তীকালে পরিবর্তিত পরিবেশে নারীর অনেক অধিকার হরণ করা হয়। এবং ক্রমে ক্রমে বিধিনিষেধের নিগড়ে বাঁধা হয় এবং নারীকে পৌরোহিত্য করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এরপর নানা সামাজিক কুপ্রথা যেমন বাল্যবিবাহ, বৈধব্য, সতীদাহ প্রভৃতি নারী নিগ্রহ

বাড়ায় এবং নারী শিক্ষালাভের পথও হয় কণ্টকাকীর্ণ। এমনকি নারীকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয় যে লেখাপড়া শিখলে নারী বিধবা হবে।[২৯]

মুসলমান নবাবদের সময় মেয়েদের সামাজিক অবস্থা আরও খারাপ হয়। সে-সময় ধনদৌলতের সঙ্গে মেয়েরাও হয় মূল্যবান লুণ্ঠন সামগ্রী। ফলে নিরাপত্তার জন্য মেয়েদের ওপর কঠোর পর্দা প্রথা আরোপ করা হয় এবং কার্যত তারা গৃহবন্দী হয়। রাজনৈতিক অরাজক অবস্থায় এই কঠোরতা আরও বৃদ্ধি পায়। প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বকালে মেয়েদের নিরাপত্তা বাড়লেও সামাজিক অনুদার অনুশাসনের কঠোরতা শিথিল হয়নি। আলীবর্দির শাসনকালে মারাঠা দস্যুদের আক্রমণের জন্য মেয়েদের আবার পাকাপাকিভাবে গৃহবন্দী হতে হয়, কারণ এরপরই সুরু হয় ইংরেজদের অত্যাচার। নিরাপত্তার নামে মেয়েদের ওপর সামাজিক অত্যাচার বেড়ে যায় অনেকগুণ। লেখাপড়া শেখার ক্ষেত্র থেকে তাদের বহু দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। বাংলায় মেয়েদের শিক্ষার এরূপ খারাপ অবস্থা হলেও ভারতের অন্যান্য স্থানে বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যে স্ত্রীশিক্ষা সর্বত্র ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল।[৩০]

কিন্তু বাংলায় এত খারাপ অবস্থা সত্ত্বেও উনিশ শতকের মত মেয়েদের শিক্ষার শোচনীয় দূরবস্থা আঠারো শতকে ছিল না। মেয়েদের ওপর বিধি-নিষেধের যত কঠোরতাই থাকুক বালিকারা অক্ষর পরিচয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল না। ৭।৮ বছর বয়স পর্যন্ত বালিকারা পাঠশালায় যাবার সুযোগ পেত। এন. এন. ল' বলেছেন, "No doubt education of the females were greatly restricted by purdah system which stand in the way of females beyond a certain age being sent to the schools, but there were no such obstacles so far as the young girls were concerned."[৩১] এই সময় মেয়েদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার খুব বেশী ছিল না, কারণ গরীব ঘরের মেয়েরা ২।৩ বছর পাঠশালায় পড়ার সুযোগ পেত এবং ধনী পরিবারের মেয়েরা বাড়ীতে গৃহশিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শিখত।

মুসলিম সমাজ মেয়েদের বিদ্যালয় শিক্ষা সম্বন্ধে বেশী বিরোধী ছিল। ফলে গরীব মুসলমান ঘরের মেয়েরা লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেত না, ধনী পরিবারের মেয়েরা যদিও গৃহশিক্ষকের সাহায্যে লেখাপড়া শিখত। রাষ্ট্র সরকার বা জমিদাররা মেয়েদের লেখাপড়ায় কোন সহযোগিতা করতেন না। মেয়েরা যা কিছু শিখত তা সবই তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়।

লেখাপড়া শেখায় এত বাধা থাকা সত্ত্বেও এ যুগে বিদুষী মহিলা বিরল ছিল না, বরং প্রশাসন, আর্থিক, বৈষয়িক প্রভৃতি বিষয়ে অনেক মহিলাকে

অগ্রণীর ভূমিকা নিতে দেখা গেছে। বিদ্যাসুন্দরের নায়িকা ছিলেন অসাধারণ বিদুষী, কবি জয়নারায়ণের আত্মীয়া আনন্দময়ী, দয়াময়ী, গঙ্গামণি প্রমুখ ছিলেন বিদুষী কবি। আনন্দময়ী অথর্ব বেদ ঘেঁটে বৈদ্যদের উপবীত ধারণের নিধান রাজবল্লভকে দেন। সে-সময় সংস্কৃতজ্ঞ মহিলা পণ্ডিতের অভাব ছিল না।[৩২] নাটোরের রানী ভবানী সে যুগের একজন বিখ্যাত মহিলা প্রশাসক। অভিজাত মুসলমান মহিলারাও বিদ্যা অর্জনে পিছিয়ে ছিলেন না। নবাবদের বেগম ও আত্মীয়াদের মধ্যে অনেকেই বিদুষী ছিলেন।[৩৩]

উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণ হয়েছে এ কথা বললে স্বীকার করতে হবে নিপীড়িত, উপেক্ষিত, অবহেলিত অধিকাংশ মানুষকে বাদ দিয়েই তা হয়েছে।

পরিশিষ্ট

১৮০১-১৮০২ সালের বাংলা-বিহারের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্টের অংশ*

	জেলা	ম্যাজিষ্ট্রেট	তারিখ	শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্টের অংশ
১.	মেদিনীপুর	এইচ. ষ্ট্র্যাটি	৩০জানু ১৮০২	বাংলা ও আঁক শেখাবার জন্য প্রতি গ্রামে বিদ্যালয় আছে। শিক্ষকরা যোগ্য, বেতন কম, কাজে মর্যাদা নেই, বেতন মাসিক ১-২ আনা, মুক্তাঙ্গন স্কুল (গৃহের অভাবে)। ধনীদের মধ্যে গৃহ-শিক্ষা প্রচলিত।
২.	বীরভূম	ডি. ক্যাম্পবেল	২৫মার্চ ১৮০২	কয়েকটি স্কুল আছে; বাংলা, ফার্সী, আরবী ভাষা

* এন. এল. বসাক: হিষ্ট্রি অফ্ ভার্নাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল অধ্যায়, II, পৃ ৫৭-৫৯ হইতে গৃহীত।

				লিখতে ও পড়তে শেখানো হয় ; ব্যক্তিগত ও অভিভাবকদের অনুদানে স্কুল চলে।
৩.	হুগলী	টি. ব্রুক	৩মে ১৮০২	প্রায় প্রতি গ্রামে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের দ্বারা পড়তে, লিখতে ও আঁক কষতে শেখে।
৪.	নদীয়া	সি. ওল্ডফিল্ড	২০জানু ১৮০২	জেলার বিভিন্ন স্থানে হিন্দু শিশুদের শাস্ত্র শেখাবার কিছু বিদ্যালয় আছে ; নিষ্কর জমির আয়ে স্কুলে চলে।
৫.	বর্ধমান	ই. টমসন	৯মার্চ ১৮০২	এমন কোন বড় গ্রাম নেই যেখানে বিদ্যালয় নেই, এখানে লিখতে ও পড়তে শেখান হয় ; মুসলমানেরা শাখা স্কুলে বা প্রতিবেশীর কাছে লেখাপড়া শেখে।
৬.	ঢাকা	এম. বার্ড ও অন্যান্য	৯জুন ১৮০২	অসংখ্য হিন্দু পাঠশালা আছে যেখানে বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে গৃহশিক্ষণ পদ্ধতির প্রচলন আছে।
৭.	ঢাকা (শহর)	জে. মেলভিল	২১ডিসে ১৮০১	অল্প পড়াশুনার স্কুল অর্থাৎ শুধু বাংলা ও ফার্সী লিখতে ও পড়তে শেখান হয়, এরকম স্কুলের সংখ্যা খুব বেশী।

৮.	চট্টগ্রাম	এল. সলনী	২৭মার্চ ১৮০২	যাদের সঙ্গতি আছে এরূপ মুসলমান বাড়ীতে মোল্লা রেখে ছেলেদের লেখাপড়া শেখায়। অন্যান্য সকলে মোল্লাকে ১-২ আনা দেয় লেখাপড়া শেখার জন্য।
৯.	জালালপুর (ফরিদপুর)	জে. প্যাটারসন	২৮জুলাই ১৮০২	শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্টের অংশ মুসলমান পরিবারে গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে, অন্যান্যরা সেখানে পড়ার সুযোগ পায়।
১০.	মুর্শিদাবাদ	টি. প্যাট্‌ল আর. রুক	২৬জানু ১৮০২	মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী যন্ত্রবিদ, দোকানীর ছেলেরা ১০ বছর পর্যন্ত পড়া, তাল-পাতায় লেখা ও আঁক কষে, আর কিছু করে না।
১১.	মুর্শিদাবাদ (সহর)	এন. ষ্টার্টি	১৭মার্চ ১৮০২	কয়েকটি বিদ্যালয় আছে, হিন্দু ও মুসলমান ছেলেরা দেশীয় ভাষা ও আইন শেখে।
১২.	পূর্ণিয়া	টি. অনহিল	১৯ডিসে ১৮০১	মুসলমান অভিজাতরা গৃহশিক্ষক রাখে।
১৩.	সিলেট	ই. রবার্টস	৩মে ১৮০২	বিভিন্ন স্থানে ছেলেদের বিদ্যালয় আছে।
১৪.	সারান	সি. বভাস	১৬ডিসে ১৮০২	প্রায় সব বড় গ্রামে বিদ্যালয় আছে। পড়া, লেখা, আঁক কষা শেখান হয়। শিক্ষককে সাপ্তাহিক বেতন দেয়।

উল্লেখপঞ্জী

১. Dharampal : A beautiful tree : History of Indegenous Education in India, eighteenth century. p. VII

২. Ibid Ibid p. IX

৩. Nurullah and Naik : History of Education in India. p. 28

৪. Dharampal : Ibid p. IX

৫. মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার : প্রাক্ পলাশী বাংলা। পৃঃ ১০৫

৬. রায়, কার্তিকচন্দ্র : ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত। পৃঃ ৪৪

৭. চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার : বাংলায় বিজ্ঞানের পুঁথি। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ১৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৮৬, পৃঃ ৩৫

৮. Ward, William : Hindoos···(1811). p. 111

৯. Ibid Ibid p. 224

১০. Dharampal : Ibid p. 67

১১. Sen, Dinesh Chandra : Typical Selection from old Bengali Literature, 2nd part, p. 1854

১২. Dharampal : Ibid p. 62

১৩. মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার : তদেব। পৃঃ ১০৯

১৪. চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার : উইলিয়াম কেরী ও শ্রীরামপুর। পৃঃ ১৪

১৫. ঐ : বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা। অষ্টাদশ শতক, দৈনিক বসুমতী, ২৫ মে, ১৯৮০

১৬. সেন, রামপ্রসাদ : গ্রন্থাবলী। পৃঃ ৫০

১৭. Dharampal : Ibid p. 15

১৮. Semenov In. I. : Quoted from Socio-economic formations and World History in Soviet and Western Anthropology ed. E. Gellner. 1930

১৯. Dharampal : Ibid p. 24

২০. Farminjar, W. K. : The affairs of East India Company. 2nd part, p. 580

২১. Basak, N. L. : Vernacular Education in Bengal. p. 14

২২. Martin R. M. : History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India. Vol. 1st and 2nd

২৩. Ibid Ibid

২৪. Marshman, J. C. : Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol. II, p. 82

২৫. Adam, W.: Report on the state of Education in Bengal. p. 6
২৬. Edinburough Review : 4th part, July, 1804
২৭. Dharampal : Ibid p. 56
২৮. Vedanayakam : Progress of Women's Education in India. p. 2
২৯. Sarkar, Jadunath : Forward in Jogesh Chandra Bagal's Women's Education in Bengal
৩০. Vedanayakam : Ibid p. 2
৩১. Law, Narendra Nath : Progress of Learning in India. Vol. II, p. 200
৩২. সেন, দীনেশচন্দ্র : বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯১০
৩৩. Banerjee, Brajendranath : Begams of Bengal

শ্রীরামপুর মিশন ও নব্যধারায় দেশীয় শিক্ষার প্রসার

মহাত্মা উইলিয়াম কেরী ও তাঁর প্রিয় পরিজন বাংলার নবজাগরণের সূচনায় যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন তা গড়ে ওঠে শ্রীরামপুর মিশন ও কলেজকে কেন্দ্র করে। কালের কঠোর অনুশাসনকে উপেক্ষা করে তাঁদের অমর কীর্তি শ্রীরামপুর কলেজ আজও সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।[১] বাংলার নবজাগরণে এই মিশন ও কলেজের অবদান অবিস্মরণীয়।

শ্রীরামপুর বা ফ্রেডারিক নগর নামে খ্যাত এই দিনেমার শহরটি কলকাতা থেকে নদীপথে পনের মাইল উত্তর-পশ্চিমে হুগলী নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। এই নগর অতি প্রাচীন হলেও শ্রীরামপুর নামটা খুব পুরোনো নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে এই অঞ্চলের আকনা ও মাহেশের উল্লেখ দেখা যায়।[২] ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে দিনেমারগণ বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের জন্য এই অঞ্চল ইজারা নেয় এবং নগর পত্তন করে। ডেনমার্কের তৎকালীন রাজা পঞ্চম ফ্রেডারিকের নামানুসারে নগরটির নাম হয় ফ্রেডারিক নগর। আঠারো শতকের শেষার্ধ হতে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত দিনেমার অধ্যুষিত এই বন্দর নগরটি ছিল জনবহুল, স্বাস্থ্যকর ও মনোরম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে ওয়ার্ডের জার্নালে আছে, "প্রকৃতি এখানে সহজ সাজে সজ্জিত; তাহার সম্পদের মধ্যে কুটীর ও কুঞ্জোদ্যানগুলি। নদীতরঙ্গে তিনি খেলা করেন, জীবধাত্রী হইয়া এখানে বিরাজ করেন। এখানে সবকিছুর ওপর কে যেন মায়ার পরশ বুলাইয়াছে।"[৩] দীনবন্ধু মিত্র সুরধুনী কাব্যে শ্রীরামপুর সম্বন্ধে লিখেছেন—

"সুধাম শ্রীরামপুর শোভা অভিরাম
হাতে ঝুলি, নামাবলী, মুখে হরিনাম।"[৪]

দেশী-বিদেশী বহু জাতির বাস ছিল এখানে। নদী-বন্দর হিসাবে এর আন্তর্জাতিক খ্যাতিও কম ছিল না। দিনেমার শাসকগণ নৈতিক দৃঢ়তা ও সাহসিকতার জন্য যেমন বিখ্যাত ছিলেন তেমনি নগরবাসীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে রাজত্ব করে যান। শ্রীরামপুর মিশনকে আশ্রয় দান ও সর্বরকম বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য দিনেমার শাসকগণের প্রচেষ্টার কথা কোন দিন বিস্মৃত হবার নয়।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ ছাড়পত্রবিহীন ব্যাপটিষ্ট মিশনারীরা ইংলণ্ড থেকে বাংলাদেশে এসে শ্রীরামপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দিনেমার গভর্নর কর্নেল বী তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং সর্বরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী উইলিয়াম

কেরী উত্তরবঙ্গের মদনাবতী থেকে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন এবং শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন করেন। মিশনের কর্মনীতির উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো আর্থিক ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল হওয়া, সকলে এক পরিবারে বাস করা এবং শুধু মিশনের জন্যই কাজ করা।[৫]

এই মিশনের গৌরবময় ভূমিকা সম্বন্ধে এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা লিখেছে, "The era of modern missions, based on associate organisations, begins with William Carey."[৬] শ্রীরামপুর মিশনকে কেন্দ্র করে কেরী শুধু ভারতবর্ষেই নয় সমগ্র প্রাচ্য এশিয়ায় ব্যাপকভাবে খৃষ্টধর্ম প্রচারের সূত্রপাত করেন। ইতিহাসে শ্রীরামপুর মিশনকে তাই "cradle of modern missions"[৭] রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে মিশন সংগঠিত হবার পর হতেই ধর্ম প্রচারের সঙ্গে বাইবেলের বঙ্গানুবাদ, বাংলা গদ্যপুস্তক প্রণয়ন, কাগজের কল ও অক্ষরের ঢালাইখানা সহ বিরাট মুদ্রণশালা প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার স্থাপন, উদ্ভিদ-উদ্যান রচনা প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে মিশনের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়। কিন্তু কাজ সুরু করার সূচনা থেকেই মিশনকে ঈর্ষাকাতর বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়।[৮] তাছাড়া মিশন-বিরোধিতার মধ্যে ভারতবর্ষকে পঙ্গু করে রাখাও কোম্পানীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মার্শম্যান লিখেছেন, "...in a state of complete ignorance that England might be enabled to hold the country without anxiety and monopolise its trade and drain its resources."[৯] কোম্পানী তার এলাকার বাইরে এই বিরাট মুদ্রণশালা থাকায় খুব বিব্রত বোধ করে এবং প্রেসটি বন্ধ করে দেবার বা কলকাতায় স্থানান্তরিত করার জন্য দিনেমার সরকারের ওপর ভীষণ চাপ দেয়। দিনেমার গভর্নরের অনমনীয় দৃঢ়তার জন্য সে প্রচেষ্টা কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। মিশনের বিঘ্নসঙ্কুল শৈশব আস্তে আস্তে শেষ হয়ে আসে। বিপর্যয় এলো এবার অন্য দিক থেকে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে মিশনের প্রেসে বিরাট অগ্নিকাণ্ড সংগঠিত হয়। এতে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় অচিন্ত্যনীয়। কিন্তু বিধ্বস্ত প্রেসকে নতুন করে গড়ে তোলায় মিশনারীরা দেখালেন অনমনীয় দৃঢ়তা, কঠোর শ্রম-সহিষ্ণুতা ও বিস্ময়কর কর্মকুশলতা। যার ফলে মিশনের চলার পথ হল সুগম।

এরপর এলো এদেশে শিক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয় বছর ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে প্রভুত্ব স্থাপনের পর অর্ধশতাব্দীকাল ধরে দেশীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। শুধু হিন্দু ও মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য আঠারো শতকের শেষের দিকে বেনারসে

একটি সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করে দেয়। কোম্পানীর একশ্রেণীর কর্মচারীরা বরং মিশনারীদের শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াসে বাধা দিতে থাকে। এই অবস্থার অবসান ঘটে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ কোম্পানীকে ১৮১৩-র চুক্তি অনুযায়ী দেশীয় শিক্ষার ব্যাপারে মনোযোগ দিতে বলে। কোম্পানী প্রথম দিকে এ ব্যাপারে নিজে সক্রিয়তা না দেখালেও মিশনারীদের ওপর বিধিনিষেধ শিথিল করে দিয়ে শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী হবার স্বাধীনতা দেয়। ফলে এদেশে নব্যধারায় শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রসারে মিশনারীরাই প্রথম এগিয়ে আসেন। নতুন সনদে কোম্পানীকে এদেশীয়দের শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার যে নির্দেশ ছিল তাকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে এদেশে ব্যাপক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন সম্পর্কে কেরী কোম্পানীকে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি দেন, "...by dividing the whole country into circles of about 150 miles diameter, in the middle of each of which should reside one superintendent of all schools within that district which should be conducted by native teachers under his direction.[১০] তাছাড়া এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিদর্শকদের শিক্ষণকার্যে উপযুক্ত করার জন্য নির্বাচিত ভারতীয়দের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষা দেবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কোন প্রস্তাবই কোম্পানী গ্রহণ করেনি। তবে এক লক্ষ টাকা খরচ করার কোন গরজ না দেখালেও শিক্ষা প্রসারে মিশনারীদের উৎসাহ দেয়। অনুকূল পরিবেশকে পুরোপুরি কাজে লাগাবার জন্য শ্রীরামপুর মিশন বিশেষভাবে প্রয়াসী হয় এবং নব্যধারায় শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টার পুরোভাগে আসে। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিন এঁদের শিক্ষা প্রসারের প্রয়াস সম্বন্ধে বলেছে, "Education...(The Serampore Baptists)...have taken the lead, and set an example ...which entitle them to be regarded, as the fathers and the founders of that blessings for the inhabitants of India."[১১] প্রবোধচন্দ্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক জার্নাল লেখে, "Their (Serampore Missionaries') educational exertions, made for the spread of knowledge in this country, [and] were such as no preceding gentlemen had made, and the benefit they confirred...such as no others before had ever confirred ; nor have we any hope that men equal to them in knowledge and benevolence will again be born...and impart such benefits unto us.[১২] শিক্ষাবিস্তারের প্রাথমিক পর্যায়ে

এঁদের অনেক বাধা-বিপত্তি ও বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিশেষ করে এঁদের এই প্রয়াসকে অনেকে ধর্মান্তরকরণের কৌশল বলে মনে করেছিলেন। খৃষ্টধর্ম প্রচার করা ছিল এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এঁদের সমস্ত কাজকেই বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে ধরে নিলে এঁদের কাজের সঠিক মূল্যায়ন করা কখনই সম্ভব নয়। মিশনের শিক্ষাপ্রণালীর রূপ, শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্র, সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে দেখলে কখনই মনে হবে না ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস। এটা ঠিক, তাঁরা আশা করেছিলেন ছাত্ররা তাঁদের ধর্মশিক্ষা আগ্রহভরে শুনুক, কিন্তু সেই আশা পূরণ বা ভঙ্গের দ্বারা তাঁদের মহৎ প্রয়াস প্রভাবিত হয়নি। মাইকেল লেয়ার্ড বলেছেন, ..."such men as May, Marshman and Thomason undoubtedly had a genuine vocation as teachers quite apart from their missionary purpose; to provide the conditions for children to develop into responsible thinking men seemed to them to be of real value in itself."[১৩] এ সম্পর্কে আরও পরিষ্কার করে বলেছেন ই. ডি. পটস্., "Many have misguidedly accused missionaries of prostituting the high calling of education by using it as a means of proslytization...Certainly they set up schools in hope of leading Indians to embrace Christianity. This after all why they had come to India. Yet if this had been solely the purpose of their schools surely they would have closed them down when it became evident that their object was not being achieved. When one reads how tenaciously the Baptists held on to and extended their educational plans it becomes clear that at least those at Serampore were interested in education for its own sake, regardless of the number of conversions achieved or not achieved."[১৪] শ্রীরামপুর মিশনও এরূপ সমালোচনার কৈফিয়ৎ প্রসঙ্গে বলেছে, "Perhaps some may be ready to ask, if this system of instruction neither makes them Christians nor Britons, what does it effect, since it leaves the natives as Hindoos as before ? To this we reply by frankly acknowledging, that in our view to make any one a real Christian is not the work of man but of God.....knowledge may remove prejudices and originate a superior correctness both of ideas

and of conduct, which may be of the highest advantage to the society,"[১৫] এদেশের সাধারণ গরীব মানুষের অজ্ঞতা দূর করার জন্য এই মিশন যে বিরাট ও ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছিলেন এবং যেভাবে পরিকল্পনাকে রূপায়িত করেছিলেন তার তুলনা আমাদের শিক্ষার ইতিহাসে নেই। অথচ খুবই পরিতাপের বিষয় যে এঁদের এই মহৎ প্রয়াসের কথা ইতিহাসে যথাযোগ্যভাবে উল্লিখিত নেই।

শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা কেরীর প্রথম হতেই ছিল এবং মালদহের মদনাবতীতে স্থিতু হবার পর ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কেরী দেশীয় বালকদের জন্য একটি বিদ্যালয় পত্তন করেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে জন ফাউণ্টেন কেরীর সঙ্গে যোগ দিয়ে বিদ্যালয়টির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মিশন সংগঠিত হবার পর শ্রীরামপুরে ১টি দেশীয় বালকদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে যশোরে চারটি, দিনাজপুরে একটি এবং কাটোয়ায় একটি এরূপ বিদ্যালয়ের সূচনা হয়। ইতিমধ্যে স্কুল-শিক্ষক মার্শম্যান বেল ও ল্যাংকাস্টার পদ্ধতিতে নিজেকে পারদর্শী করে তোলেন এবং ঐ পদ্ধতিতে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা করেন। এরূপ চিন্তা করার মূল কারণ, দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষালাভের প্রতি প্রবল আগ্রহ। বিদ্যালয়ের সংখ্যাও ইতিমধ্যে কিছু কিছু বাড়ে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দেই অন্তঃত আটটি বিদ্যালয় চালু হয়।[১৬]

এদেশে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষা প্রবর্তনের সময় শ্রীরামপুর মিশন অন্যান্য সকলের মত দেশীয় প্রচলিত ব্যবস্থাকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করেনি। বরং বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে দেশীয় শিক্ষা সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করে। ১৮১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে Hints Relative to Native Education নামে একটি পুস্তিকা মিশন প্রকাশ করে। ভারতে শিক্ষা বিষয়ক তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা এইটিই প্রথম। জন ক্লার্ক মার্শম্যান এ সম্বন্ধে বলেছেন, "It is very interesting to note that Dr. Marshman's scheme is the first organised plan for the establishment of schools which had ever been deviced in India."[১৭] এই পুস্তিকাটি সে-সময় ভারতে ও ভারতের বাইরে শিক্ষানুরাগীদের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগিয়ে তোলে। দেশীয় বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক কারণ ব্যাখ্যা করার সময় এঁরা এদেশের বেশীর ভাগ অধিবাসীদের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং সেই সঙ্গে সাধারণ লোকের নিদারুণ আর্থিক দুরবস্থার বিষয়টিও বিশেষ সংবেদনশীলভাবে অনুভব করেন। আরও লক্ষ্য করেন যে গ্রামাঞ্চল ও সহরাঞ্চলে যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে সেগুলির অবস্থা

অত্যন্ত শোচনীয়। উপযুক্ত শিক্ষক, সুনির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রণালী, মুদ্রিত পুস্তক প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব এই বিদ্যালয়গুলিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে রেখেছে। Hints-এ এঁরা বলেছেন, "The gain in these schools is so small that it does little more than serve to darkness visible."[১৮] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমাদের গ্রাম্য সমাজ-জীবনের অর্থনৈতিক কাঠামো যেভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল তাতে এরূপ চিত্র সে-সময় খুব অস্বাভাবিক ছিল না। তখন গ্রাম্য পাঠশালাগুলির টিকে থাকাটাই বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। Hints-এর পরিকল্পনায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে কি শিক্ষা এঁরা দিতে চান। প্রথমেই বলেছেন যেরূপ শিক্ষাই দেওয়া হোক না কেন, তা দেওয়া হবে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায়। এঁদের মতে "Whatever ends besides might be answered by introducing among them the English language, the hope of imparting efficient instruction to them, or indeed to any nation in a language not their own, is completely fallacious."[১৯] শিক্ষাদানের প্রথম উদ্দেশ্য হিসাবে বলেন, "improving them in the knowledge of their own language." বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীরামপুর মিশন ব্যতীত সে-সময় কেউই বিষয়টির ওপর এতো গুরুত্ব দেয়নি। এদেশের অধিকাংশ ভাষাসমূহের উৎস এবং সুসমৃদ্ধ বলে সংস্কৃতের প্রতিও মিশন যথোপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শন করে। আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষাকে তাঁদের পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেবার সময় বলেছেন, "But the chief advantange derivable from this plan is ···· ideas for which India must be indebted to the West, at present the seat of science, and for the communication of which generations yet unborn will pour benedictions on the British name."[২০] এ কথা কি আজ আমরা অস্বীকার করতে পারি? এঁদের পরিকল্পনার মধ্যে দিয়েই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বার্তা প্রথম আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়। বিজ্ঞান এঁরা পুঁথিগত বিদ্যার মত পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে শেখাতে চাননি, চেয়ে-ছিলেন নানা উদাহরণের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্যের প্রতি এদেশীয়দের অনুভূতি ও সচেতনতা সৃষ্টি করতে। তাছাড়া ভূগোল, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতির যথোচিত শিক্ষা দেবার পরিকল্পনা এঁরা করেছিলেন। পরিশেষে নীতি শিক্ষার ওপর জোর দেবার কথাও বলেছেন। স্থানীয় পরিবেশের পটভূমিতেই বিষয়বস্তুগুলি নির্বাচিত হয় এবং পরিকল্পনা বাংলাদেশের জন্য রচিত হলেও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যে (ব্রহ্মদেশ সমেত) প্রবর্তিত যাতে করা যেতে পারে, তার নির্দেশও এতে ছিল।

এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে রূপায়িত করার উপায় সম্বন্ধেও Hints-এ বিস্তৃত আলোচনা আছে। এদেশীয়দের উপযোগী করে ল্যাংকাস্টার প্রবর্তিত প্রণালীকে এঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রণালীতে সারণী ও বই উভয়কে কাজে লাগাবার নির্দেশ আছে, ছাত্রদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করার কথা আছে এবং শিক্ষকদের সাহায্য করার জন্য মনিটর গ্রহণেরও সুপারিশ আছে। কম খরচে বেশী ছাত্রকে তাড়াতাড়ি শিক্ষা দেবার কাজে বড় আকারের সারণী খুবই উপযোগী ছিল। তাছাড়া বানানের শুদ্ধতা ও সঠিক গণনায় এই সারণীর কার্যকারিতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার বিষয় ছিল নিম্নলিখিতগুলি—(১) দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য বর্ণ, শব্দ, বাক্য ও প্রাথমিক ব্যাকরণ (২) প্রাথমিক গণনা ও গণিত (৩) সৌরজগৎ, সেই সঙ্গে গতি, বল, আকর্ষণ, অভিকর্ষণ প্রভৃতি (৪) প্রাথমিক ভূগোল (স্থানীয় অঞ্চলের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে), (৫) আলো, তাপ, বায়ু, জল, আবহাওয়াতত্ত্ব, ধাতুবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান-বিষয় (৬) ইতিহাস (৭) নীতিশিক্ষা। বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন ঃ—(১) মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক (২) বিদ্যালয় পরিচালনা ও শিক্ষা তত্ত্বাবধান এবং (৩) ছাত্রদের আর্থিক সংগতি ও বিদ্যালয়ে যোগদানের সুযোগ-সুবিধা। মুদ্রিত পুস্তকের অভাব এদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল। মিশন বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার সঙ্গে সারণী, বিজ্ঞানের কপিবুক, ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক বই, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করে। শিক্ষাবিস্তারে মিশনের সাফল্য অনেকাংশে এই মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তকের জন্যই হয়েছিল। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে মিশন ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় পাঁচশত টাকা খরচ করে। মিশন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকগুলি সে যুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ডাঃ উইলিয়ম কেরী, ডাঃ জশুয়া মার্শম্যান (সম্পাদক) ও রেভাঃ উইলিয়াম ওয়ার্ডকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। মিঃ জন ক্লার্ক মার্শম্যান ছিলেন সহ-সম্পাদক ও সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক। কমিটি বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন, শিক্ষক নিয়োগ, পরিদর্শক নিয়োগ, পুস্তকাদি ও আসবাবপত্র সরবরাহ প্রভৃতি সবরকম দায়িত্ব বহন করতো। নির্ধারিত প্রণালীতে শিক্ষক মনিটরের সাহায্যে শিক্ষাদান করতেন এবং পরিদর্শক তত্ত্বাবধান করতেন নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কিনা। উপযুক্ত শিক্ষক তৈরীর জন্য শ্রীরামপুরে একটি নর্ম্যাল স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল। শিক্ষকতায় যোগদানের পূর্বে প্রত্যেক শিক্ষককে শ্রীরামপুর নর্ম্যাল বিদ্যালয় এবং ১৮১৮ সালের পর শ্রীরামপুর কলেজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। কোন গ্রাম

যদি মিশনের নিকট বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আবেদন করতো তবে প্রথমে একজন শিক্ষক নির্বাচন করে শ্রীরামপুর নর্ম্যাল বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাঠাতে হতো। একাধিক ব্যক্তি এলে মিশন পরীক্ষার দ্বারা তাদের মধ্য হতে একজনকে নির্বাচন করতো। মিশনের পরিদর্শক গ্রামে উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করে বিদ্যালয়-গৃহ ভাড়া করতো। বিদ্যালয়-গৃহের ভাড়া ছিল সাধারণত দেড় টাকা। কখনও কখনও গ্রামের জমিদার বা কোন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ নিজের বাড়ীর অংশ বা চণ্ডীমণ্ডপ বিদ্যালয়ের জন্য ছেড়ে দিতেন। বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ভার মিশন বহন করতো এবং সেজন্য মিশন চাঁদা ও দান সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিল। কোনরূপ সরকারী অনুদান তাঁরা পাননি। বিদ্যালয়ের খরচ ছিল নিম্নলিখিত রূপ ঃ

শিক্ষকের মাহিনা	...	৭½ টাকা
মনিটরের ভাতা	...	১ ,,
বিদ্যালয়-গৃহের ভাড়া	...	১½ ,,
বই, খাতা, কলম ইত্যাদি	...	১½ ,,
		মোট ১১½ টাকা[২১]

এছাড়া প্রতি বিদ্যালয় তত্ত্বাবধানের জন্য পরিদর্শককে মাসিক ৫ টাকা হারে বেতন দিতে হতো। অতএব মোট ব্যয় ১৬½ টাকা। গড়ে প্রতি বিদ্যালয়ে যদি ৭০ জন ছাত্র ধরা হয়, তবে প্রতি ছাত্রপিছু মাসিক গড় ব্যয় দাঁড়ায় ¼ টাকার কিছু কম। শিক্ষার ব্যয় সম্বন্ধে এঁরা বলেছেন, "The expense of educating each Hindoo youth, including school rooms, books, tables, teachers, monitors, superintendence will come within three rupees annually."[২২] এবং ব্যয়ভার সম্বন্ধে বলেছেন, "It is our wish, as long as Providence shall enable us, to support as many schools from the proceeds of our own labour"[২৩] কিন্তু বিদ্যালয় স্থাপনে শ্রীরামপুরের চতুষ্পার্শ্বের গ্রামগুলির প্রচণ্ড আগ্রহ দেখে এঁরা বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য চাঁদা তোলার সিদ্ধান্ত নেন, কারণ অত বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা তাঁদের ছিল না।

Hints-এ প্রকাশিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ হতেই মিশন শ্রীরামপুরের চারপাশে ও বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিদ্যালয় স্থাপন করতে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে নানা বাধা বিপত্তি আসা সত্ত্বেও অল্পদিনের মধ্যেই নগরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে বিপুল সাড়া জাগায় এঁদের বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব। এরূপ সাড়া মিশনারীরা আশা করেনি। প্রথম বার্ষিক বিবরণীতে আছে, "Notwithstsanding all these circumstances, the reception which the plan has met with, has been such as

greatly to exceed our previous expectations."[২৪] এক বছরের মধ্যেই মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় এক শতের ওপর এবং ছাত্র সংখ্যা হয় সাত হাজারের বেশী। পরবর্তী বছরে আরও ছাত্র সংখ্যা বাড়ে। লর্ড হেস্টিংস মিশনের এই শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াসকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন এবং তাঁর বার্ষিক ছ'হাজার টাকা অনুদান পেয়ে মিশন রাজস্থানের আজমীরে কয়েকটি হিন্দী বিদ্যালয় স্থাপন করে। বাংলা দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল নিম্নলিখিতরূপ ঃ[২৫]

জেলার নাম	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
হুগলী জেলা (শ্রীরামপুর সমেত)	৫৪	৩৬৮৪
চব্বিশ পরগণা	২২	১৩৭০
হাওড়া	১৮	১০৭৭
বর্ধমান	৭	৬৫৬
ঢাকা	৫	২৭৮
মুর্শিদাবাদ	৩	১০০
মোট—	১০৯	৭১৬৫

সন্দেহভাজন ও প্রভাবহীন হওয়া সত্ত্বেও মানবতাবাদী এই মিশনগোষ্ঠী কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে গণশিক্ষার সূচনা করেন। এর মূলে ছিল এদেশের সাধারণ লোকের শিক্ষার প্রতি অপরিমেয় আগ্রহ যা পরবর্তীকালের অবহেলায় অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়।

মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ— (১) প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি খুব চিত্তাকর্ষক। (২) ধনী, দরিদ্র, সকল জাত ও সকল সম্প্রদায়ের ছেলেদের জন্য বিদ্যালয়ের দ্বার ছিল অবারিত। (৩) বিদ্যালয়ের সমগ্র ব্যয়ভার মিশন বহন করতো। মিশনের সীমিত আর্থিক সংগতির জন্য চাঁদা ও দান সংগ্রহ করা হতো। (৪) শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা বাংলাকে গ্রহণ করা হয়েছিল। (৫) স্থানীয় অঞ্চলের কথা ও ভাষাশিক্ষা পাঠ্যসূচীতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। (৬) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সুসম সংমিশ্রণ করা হয়েছিল। (৭) যুগোপযোগী জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত, ভূগোল প্রভৃতি সুসম অনুপাতে পাঠ্যসূচীতে ছিল। (৮) মুদ্রিত পুস্তক, চার্ট, কপিবুক প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। (৯) নীতি ও ধর্মশিক্ষাকে সাধারণের গ্রহণীয়ভাবে দেবার ব্যবস্থা ছিল। (১০) সর্বোপরি দেশের অবহেলিত গরীব দুঃখী মানুষের নিরক্ষরতা, অশিক্ষা ও অজ্ঞতা দূরীকরণে ছিল আন্তরিক প্রয়াস।

এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্যই সে-সময় অন্য সব মিশনের বিদ্যালয়গুলি থেকে শ্রীরামপুর মিশনের বিদ্যালয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল এবং অল্প সময়ের

মধ্যে এতো বেশী সাড়া জাগাতে পেরেছিল। বিদ্যালয়গুলির প্রতি সাধারণ লোকের মনোভাব প্রথম দিকে কিছুটা বিরূপ থাকলেও পরে এঁদের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং শিক্ষানুরাগী মনোভাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধনী দরিদ্র সকলেই এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। বিশিষ্ট মনীষীরাও এঁদের শিক্ষা প্রসারের প্রয়াসকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন এবং অনেকে এঁদের তহবিলে অর্থ দান করেন। দাতাদের মধ্যে স্যার হাইড ঈষ্ট, স্যার এড্‌মন্‌ষ্টোন, রাজা রাধাকান্ত দেব, শ্রীকালীশঙ্কর ঘোষাল, শ্রীরসময় দত্ত প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া সঙ্গতি সম্পন্ন গ্রামবাসীরাও (হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের) মিশনের তহবিলে মুক্তহস্তে দান করতেন।

১৮১৩ সালের আগে বা পরে এদেশে শিক্ষা প্রসারে শুধু মিশনারীরাই অগ্রণী হয়েছিল এবং শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে আরও কয়েকটি মিশনারী সংগঠনও এদেশে শিক্ষাপ্রসারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।[২৬] হেনরী ক্রেটন ও জন এলারটন গোমালতির নীলকুঠি এলাকায় দেশীয় বালকদের জন্য ১৮০৪ হতে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এলারটনকে শ্রীরামপুর মিশন বিভিন্নভাবে সাহায্য করে।[২৭] এঁদের শিক্ষাপ্রসারের প্রয়াস পরবর্তীকালে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ টমাসনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির ফরসাইথ ওলন্দাজ নগরী চুঁচুড়ায় ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে বিশেষ সাফল্য লাভ করেননি। তাঁর উত্তরসাধক রবার্ট মে-ই পরে এ অঞ্চলে কৃতিত্বের সঙ্গে বিদ্যালয়-শিক্ষা পরিচালনা করেন।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের পর মিশনারীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করা সুরু করে এবং শ্রীরামপুর ছাড়া চুঁচুড়া, বর্ধমান ও কলিকাতার মিশন বিদ্যালয়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতায় বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সরকারি ও বেসরকারি অনেক শিক্ষাবিদ্‌ই সেজন্য যথেষ্ট সাহায্য করেন। কিন্তু শ্রীরামপুর মিশন, লণ্ডন মিশন ও চার্চ মিশন ছাড়া কেউই তাঁদের প্রচেষ্টাকে কলিকাতার বাইরে বিস্তৃত করার আগ্রহ দেখাননি। চার্চ মিশনের ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট বর্ধমানকে কেন্দ্র করে কাছাকাছি অঞ্চলে ১৭টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং লণ্ডন মিশনের রবার্ট মে চুঁচুড়া ও তার চারপাশে ৩৬টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে মাসিক ৮০০ টাকা অনুদান পেতেন।[২৮] এঁদের প্রয়াস ঐ দুটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। শিক্ষাকে বাংলার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে এমন কি সারা উত্তর ভারতে ছড়িয়ে দেবার দুঃসাহসিক প্রয়াস একমাত্র শ্রীরামপুর মিশনই গ্রহণ করে এবং এর জন্য সরকারের কোন আর্থিক সাহায্য

প্রত্যাশা করেনি (শুধু রাজস্হানের বিদ্যালয়ের জন্য লর্ড হেস্টিংস বার্ষিক ৬০০০ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন)। নিম্নের তালিকায় বিভিন্ন সোসাইটির শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টার একটি চিত্র দেওয়া হল ঃ—[২৯]

প্রতিষ্ঠানের নাম	বিদ্যালয় স্থাপনের বছর	অঞ্চলের নাম	বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৮১৮ খৃঃ	ছাত্র সংখ্যা ১৮১৮ খৃঃ
লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি	১৮১৪	চুঁচুড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল	৩৬	২৬৯৫
শ্রীরামপুর মিশন	১৮১৬	শ্রীরামপুর, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, ঢাকা, বর্ধমান, যশোর, বীরভূম, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, আজমীর প্রভৃতি	১১১	৪০৯৭
চার্চ মিশন সোসাইটি	১৮১৬	কলিকাতা ও বর্ধমান	২৭	১৭৫৫
এস. পি. সি. কে.	১৮১৮	কলিকাতা	৬	৪০০

১৮২৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ১৬০টির বেশী বাংলা প্রাথমিক বিদ্যালয়, কয়েকটি ইংরাজী ও ফার্সী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এগুলির বেশীর ভাগই শ্রীরামপুর মিশন পরিচালনা করতো। তাছাড়া অন্যান্য মিশনারী সংগঠনকেও বিদ্যালয় পরিচালনা, পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ প্রভৃতিতে এই মিশন যথেষ্ট সাহায্য করে।

মিশনারীরা যখন এদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্হার সংস্কার ও প্রসারে ব্রতী হন তখন এদেশে মেয়েদের জন্য শিক্ষার কোন ব্যবস্হাই ছিল না। হিন্দু শাস্ত্রে যদিও স্ত্রীশিক্ষার নিষেধ ছিল না, তবু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে সামাজিক কুসংস্কার এতো প্রবল হয় যে বৈধব্যের ভয় দেখিয়ে জোর করে মেয়েদের শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে রাখা হয়। সামাজিক অনুশাসনের নামে মেয়েদের ওপর তখন যে পাশবিক অত্যাচার হতো, তার পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রীশিক্ষার কথা চিন্তা করার সাহস কেউ করতো না। বালিকা বিদ্যালয় তখন একটিও ছিল না। তবে সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েদের মধ্যে কিছু কিছু পাঠাভ্যাস প্রচলিত ছিল। তাঁরা নিজ নিজ গৃহে আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যে পড়াশুনা

করার চেষ্টা করতেন। সে-সময় সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন মেয়ের সংখ্যা খুবই ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মিশনারীরাই প্রকৃতপক্ষে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনে প্রথম ব্রতী হন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশীয় সমাজের প্রবল বিরোধিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার দুঃসাহস দেখাতে শ্রীরামপুর মিশনই প্রথম এগিয়ে আসে। এদেশের মেয়েদের দুঃখ-দুর্দশা ও চরম লাঞ্ছনা প্রথম হতেই মিশনারীদের উদ্বেলিত করে, তবে পরিবেশ ও সুযোগের অভাবে প্রথমদিকে কিছু করে উঠতে পারেনি। ১৮১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের একটি বিদ্যালয়ে বালিকাদের ভর্তি করা হয় এবং চিকের আড়ালে রেখে তাদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। মিশন বিদ্যালয়ের প্রথম বিবরণীতে আছে, "In some instances girls have wished, and have been permitted, to partake of the instruction imparted by the Institution."[৩০] মেয়েদের বিদ্যালয়শিক্ষা দেবার প্রয়াস এদেশে এইটি প্রথম। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মে চুঁচুড়াতেও মেয়েদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলিকাতায় ১৮১৯-এর পর বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা করে তিনটি মহিলা মিশনারী সংগঠন—ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি, লেডিজ্ সোসাইটি ও লেডিজ্ এ্যাসোসিয়েসন। কলিকাতার এই সংগঠনগুলি ইউরোপীয় ও ভারতীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা লাভ করে। সামাজিক অনুদারতা গ্রাম অপেক্ষা কলিকাতায় অনেক কম ছিল, সেজন্য শ্রীরামপুর মিশনকে এদের অপেক্ষা অনেক বেশী সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার পরিচয় দিতে হয়।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ ওয়ার্ডের নেতৃত্বে শ্রীরামপুর মিশন শ্রীরামপুর ও তার চারপাশের গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের সূত্রপাত করে। ১৮২১ হতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের বিবরণ হতে দেখা যায় মিশনের বালিকা বিদ্যালয় শুধু বাংলা নয়, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রসারিত হয়েছে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের বিবরণে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের যে সংখ্যা পাই নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ—[৩১]

স্থান	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
শ্রীরামপুর	১৩	২৫০
বীরভূম	৬	৪৪
ঢাকা	৫	১০০
চট্টগ্রাম	৩	৭৭
যশোহর	১	১৫
আকিয়াব (ব্রহ্মদেশ)	১	৬
এলাহাবাদ	১	৫
বেনারস	১	১৩
	৩১	৫১০

সে-সময় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রবর্তিত বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ—[৩২]

প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রথম বিদ্যালয় স্থাপনের বছর	অঞ্চল	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি	১৮১৯	কলিকাতা	২০	৪০০
লেডিজ সোসাইটি	১৮২১	কলিকাতা	৩০	৬০০
শ্রীরামপুর মিশন	১৮২১	শ্রীরামপুর, বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল	৩১	৫১০
লেডিজ এ্যাসোসিয়েসন	১৮২৫	কলিকাতা	১০	১৬০

তাছাড়া লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি চুঁচুড়া ও বহরমপুরে এবং চার্চ মিশনারী সোসাইটি বর্ধমান, কালনা, বাঁকুড়া ও কৃষ্ণনগরে পরবর্তী দশকে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে।[৩৩] রাজা রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ ভারতীয় মনীষীবৃন্দও এগিয়ে আসেন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সহায়তায়। মিশনারীরা বাংলাদেশে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রবর্তন করলেও এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে তাঁদের প্রয়াস পরবর্তীকালে আশানুরূপ সুফলপ্রসূ হয়নি।

বিদ্যালয় স্থাপনে আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করায় মিশন উচ্চশিক্ষা নিকেতন স্থাপনে আগ্রহী হয়। তাঁদের আগ্রহ ফলপ্রসূ হয় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে। এই বছর ১৫ই আগষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুর কলেজ। ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে শ্রীরামপুর কলেজ একটি সুপরিচিত নাম। কলেজের নামকরণে আশ্রয়দাত্রী স্থান শ্রীরামপুরকে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাতাগণ নিজেদের ঔদার্য ও মহানুভবতার বিশেষ পরিচয় দিয়ে গেছেন। শ্রীরামপুর-মিশনারিদের শিক্ষা প্রসারের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই কলেজ সুদীর্ঘ ১৭৫ বছর বাংলা তথা ভারতে শিক্ষাবিস্তারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আজও গৌরবের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় প্রধানতঃ বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক সরবরাহ এবং দেশীয় ধর্মযাজক তৈরী করার জন্য। তবে প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য সাহিত্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার করা। উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলা হয়, "This Institution was to be a college for the instruction of Asiatic Christians and other youths in Eastern literature and Western science. The aim of the college was to improve the minds of the pupils to any extent which might

appear desirable, eventually supplying them instruction in every branch of knowledge peculiarly suited to promote the welfare of India.[৩৪] সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল কোন সংকীর্ণ নীতির দ্বারা কলেজের পরিসরকে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। বরং সকলের জন্য দ্বার অবারিত করা হয়। কলেজ ষ্টাটুটের ১৩নং ধারায় সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে, No caste, colour or country shall bar any man from admission into Serampore College."[৩৫] এই কলেজের আগে একটিমাত্র কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেটি হল ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ। পরে এটি প্রেসিডেন্সী কলেজ নামে সরকারের তত্ত্বাবধানে চলে যায়। শ্রীরামপুর কলেজ কিন্তু সম্পূর্ণ মিশনের কর্তৃত্বাধীনে একশ পঁচাত্তর বছর পরিচালিত হয়ে আসছে। তাই হিন্দু কলেজের এক বছর পরে প্রতিষ্ঠিত হলেও ভারতের প্রাচীনতম জীবিত বেসরকারী কলেজ এইটি। সে যুগের নবভাবধারা অনুযায়ী এঁরা ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করেননি, বরং উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কৃতকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেন। তা বলে এঁরা গোঁড়া প্রাচ্যবিদ ছিলেন না। প্রাচ্যের জ্ঞানের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনে ব্রতী হন এই মিশনারীরা। উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে দেশীয় ভাষাকেই এঁরা বিনা দ্বিধায় নির্বাচন করেন। এঁদের সুস্পষ্ট মত ছিল যে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায় না এবং বিশেষ করে সর্বসাধারণের মধ্যে কখনই শিক্ষাবিস্তার করা সম্ভব নয়। এই অভিমত, সে যুগে কেউই বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে এঁদের মত ছিল, "...they apprehend that such a step (introduction of English education) in the first instance would go far towards frustrating the very design of the institution. ...the moment a native youth found he had enough of English to enable him to copy an English letter, a stop would have been put to his studies....They imagined there was a prospect for their getting sixteen or twenty rupees monthly as English copyists in the metropolis, this course therefore, instead of promoting the welfare of the country, would have transformed its finest youth into mercenary copyists, ignorant of their own language, and even of English as to any purpose of mental improvement,[৩৬] শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারার যে মতবিরোধ উপস্থিত হয় তাতে এই মিশন উভয় ধারার সমন্বয়ে গঠিত মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে। এ সম্পর্কে E. D. Potts বলেছেন, "Despite the initial

emphasis on Sanskrit learning the college founders were not strict 'Orientalists' in respect to advance education and took a middle position between that group and 'Anglicists'. It was obviously not their intention to start an English College similar to the one later pioneered by Alexander Duff in Calcutta. Neither did they plan a centre based solely on English learning and Languages.[৩৭] এঁদের আশঙ্কা ছিল যে ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা শিক্ষিতরা দেশের মাটির সঙ্গে সংযোগ হারাবে। দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে এদের আর যোগ থাকবে না, দেশের সমাজ থেকে এরা হয়ে যাবে বিচ্ছিন্ন, আর প্রাচ্য সাহিত্য-দর্শনের বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার এদের কাছে রুদ্ধ হয়ে যাবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বিরাট অনুবাদ বিভাগ মিশন পত্তন করে এবং বহুদিন ধরে তার দায়িত্ব বহন করে।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মিশন যখন কলেজ স্থাপন করে তখন শ্রীরামপুরের দিনেমার গভর্নর কর্নেল ক্রেফ্‌টিং যথেষ্ট উৎসাহ দেন এবং কলেজের গৃহ নির্মাণের জন্য বার বিঘা জমি সংগ্রহ করে দেন।[৩৮] তিনি কলেজের প্রথম গভর্নরের পদও গ্রহণ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংসও কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে খুব খুশী হন এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক হতে সানন্দে সম্মতি দেন। প্রথম বছরে কলেজের ছাত্রসংখ্যা হয় ৩৭ জন, এদের মধ্যে ১৯ জন ক্রীশ্চান, ১৪ জন হিন্দু ও ৪ জন কোন ধর্ম বা জাতের নয়।[৩৯] ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কলেজের সুরম্য ভবন নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। এই অট্টালিকাটি ভারতের সুন্দর কলেজ ভবনগুলির অন্যতম বলে আজও সুপরিচিত। এটি নির্মাণে যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হয় তা প্রতিষ্ঠাতাগণ নিজেদের উপার্জিত অর্থ থেকে দেন। এতো অর্থ ব্যয়ে গৃহ নির্মাণ করার জন্য মিশনারীদের নানা বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু সমালোচনা তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টাকে একটুও ব্যাহত করেনি। তাঁরা বোধহয় জানতেন কোনকিছুর স্থায়িত্বই ভারতের প্রধান সমস্যা এবং স্থায়িত্বের আশাতেই তাঁরা বিপুল অর্থ ব্যয়ে এই অট্টালিকা নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। বিদ্যালয়শিক্ষার মত উচ্চশিক্ষার জন্যও একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ভাষা, সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতির সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারায় জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য উপযুক্ত বীক্ষণাগার এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্য একটি মানমন্দির গড়ে তোলা হয়। কলেজে শরীরতত্ত্ব ও চিকিৎসাবিজ্ঞান বিভাগ খোলার পরিকল্পনাও সম্পূর্ণ

হয়েছিল কিন্তু ফেলিক্সের মৃত্যু ও আর্থিক অনটনের জন্য তা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনি। কেরীর সুবিখ্যাত উদ্ভিদ উদ্যান উদ্ভিদতত্ত্ব ও কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষে বিশেষ সহায়ক ছিল। কলেজ স্থাপনে বিপুল অর্থ ব্যয়, বহু বিদ্যালয় পরিচালনা এবং নানা দৈব-দুর্বিপাকের জন্য কলেজের প্রাথমিক অবস্থাতেই নিদারুণ অর্থসংকট উপস্থিত হয়। জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখেছেন, "The pecuniary difficulties were found to cripple the operations the college and to impede its progress."[৪০] দুর্যোগময় ঝড়-ঝাপ্টার মধ্য দিয়ে শৈশব উত্তীর্ণ হলে প্রতিষ্ঠাতাগণ কলেজের স্থায়িত্ব দৃঢ় করার কাজে ব্রতী হন। মার্শম্যানের আশা ছিল আরও বিরাট। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হতে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদান করার জন্য ইউরোপীয় দেশগুলির মত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্বপ্ন তিনি দেখতেন। সেই স্বপ্ন সফল করার জন্য রাজকীয় সনদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কে যান। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কের রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডারিক শ্রীরামপুর কলেজকে ডিগ্রী প্রদান করবার অধিকার দিয়ে একটি সনদ দান করেন। ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মত ডিগ্রী প্রদান করার ক্ষমতা এশিয়ার মধ্যে শ্রীরামপুর কলেজই সর্বপ্রথম পায়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কের রাজকীয় সনদ অনুযায়ী কলেজ পরিচালনা করার বিধি লিপিবদ্ধ হয়। এই বিধি অনুযায়ী গঠিত প্রথম কলেজ কাউন্সিলের সদস্য হলেন ডাঃ উইলিয়াম কেরী, ডাঃ জশুয়া মার্শম্যান ও মিঃ জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ গ্রন্থাগার সংগঠনের ওপর মিশন প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয়। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সুরু হয় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মিশন প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই। কেরীর সহযোগী জন ফাউন্টেনের ওপর গ্রন্থাগার সংগঠনের ভার পড়ে। কেরীকে সাহায্য করার জন্য ফাউন্টেন এদেশে আসেন এবং মদনাবতীতে কেরীকে বিদ্যালয় পরিচালনা করার কাজে বিশেষ সহায়তা করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তিনি কেরীর সঙ্গে শ্রীরামপুরে চলে আসেন। গ্রন্থাগার সংগঠনের কাজ হাতে নেবার কয়েক মাস পরেই তাঁর জীবনাবসান হয়। ফলে এ কাজ পরবর্তী কয়েক বছরে বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কলেজ প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাবের সঙ্গে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিশেষ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কলেজের prospectus-এর মধ্যে বলা হয়, "To promote these objects (of the college), a library shall be formed to include the Vedas the Durshunas, the Puranas and all other Sungskrit works now to be obtained on any art or science, all the works obtainable in the various

popular dialects of India, of whatever nature they may be, the most approved Arabic and Persian authors, with every work in them having any reference to the doctrines of Hindooism or the affairs of India……the best authors in Greek and Latin, the best works in Italian, French, Portugese, the most approved works on divinity, history, and science in the English language."[৪১]

কলেজ ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা হলে গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট হয় নীচের তলের সুদীর্ঘ দুটি কক্ষ। ১৮২১ সালের বিবরণে দেখা যায়, "The middle part (of the groundfloor) being intended for the chapel and the two side partitions for the library"[৪২] ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কলেজ ভবনের নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে গ্রন্থাগারকে নির্দিষ্ট কক্ষে স্থানান্তরিত করা হয়। পুস্তক, পত্রিকা, পুঁথি সংগ্রহে সংগঠকদের আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল প্রবল। তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আবেদনপত্র পাঠান এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। আবেদনে সাড়া দেন অনেক মনীষী। বহু মূল্যবান গ্রন্থ সংগৃহীত হয় গ্রন্থাগারে। দাতাগণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভারতের রাজা রামমোহন রায়, ফ্রান্সের অধ্যাপক ফিফার, অষ্ট্রিয়ার অধ্যাপক ভেটর এবং ইংলণ্ডের রেভারেণ্ড মাইকেল ও আইটন। প্রতিষ্ঠাতাগণ তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ—তিন হাজারেরও বেশী বই ও পুঁথি কলেজ গ্রন্থাগারে দান করেন। প্রতিষ্ঠাতাগণের শিক্ষাবিস্তারের মহান প্রয়াসের সাক্ষ্যবহনকারী এই গ্রন্থাগারটি আজও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮২০-২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মিশনের শিক্ষা বিস্তার প্রয়াস বিভিন্ন ধারায় সুপ্রসারিত হয় এবং কর্মক্ষেত্রও হয় সুবিস্তৃত, ফলে কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় প্রচুর অর্থ ও উপযুক্ত পরিচালক-বৃন্দের। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ডের মৃত্যু এবং বিভিন্ন সময়ে মিশনের অর্থ সংকট সুষ্ঠু কার্য পরিচালনাকে কঠিন করে ফেলে। কেরী ও মার্শম্যানের জীবদ্দশায় কর্মধারা বজায় থাকলেও তাঁদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে মিশনের কর্মপ্রয়াসের সমস্ত ধারাই প্রায় সংকুচিত হয়ে আসে। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও দেশ সেবার যে মহান ব্রত নিয়ে তাঁরা শ্রীরামপুর মিশনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁদের পর আর কেউ রইলেন না সে প্রয়াসকে অব্যাহত রাখার জন্য। নানা কারণ আছে মিশনের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হবার। মিশনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং ইংলণ্ডের ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির সঙ্গে মতবিরোধ বোধহয় কারণগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রধান। প্রতিষ্ঠাতাগণের উদার দৃষ্টিভঙ্গি

এবং শ্রীরামপুর মিশনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল এদেশীয় প্রতিষ্ঠান-রূপে গড়ে তোলার চেষ্টাও সকলে খুব ভালো চোখে দেখেনি। আর্থিক ব্যাপারে মিশনকে তাই প্রতিষ্ঠাতাগণের স্বোপার্জিত অর্থ এবং সহানুভূতি-শীল ব্যক্তিগণের দানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকতে হয়েছিল এবং এই দান সংগ্রহও হোতো বিশেষ করে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। সুবিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের যে বিরাট দায়িত্ব মিশন গ্রহণ করে তাকে অব্যাহত রাখার আর্থিক সামর্থ্য মিশনের ছিল না এবং সেজন্য প্রতিকূল অবস্থার সংকট কাটিয়ে ওঠা কেরী মার্শম্যানের পরে মিশনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শিক্ষা ব্যাপারে মিশনের নিজস্ব ধারা থাকায় এবং তা ইংরাজী শিক্ষা মতাবলম্বী বা প্রাচ্যশিক্ষা মতাবলম্বীদের কোনটিরই অনুরূপ না হওয়ায় সে যুগের এই দুটি শক্তি-শালী কোন পক্ষই মিশনের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যান্য মিশনারী সোসাইটি ও দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ বৃদ্ধি হওয়ায় কলিকাতায় কর্মতৎপরতা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অল্প দিনের মধ্যেই কলিকাতা বাংলা তথা ভারতের আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। সমস্যা জর্জরিত শ্রীরামপুরের পক্ষে তখন কর্মক্ষেত্র বিস্তার বা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা মোটেই সম্ভব ছিল না। ফলে ১৮৩৭ সালের পর হতেই মিশনের শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস স্তিমিত হয়ে আসে। পট্‌স্‌ ও লেয়ার্ড মনে করেন শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রীরামপুর মিশন খৃষ্টধর্মের সম্পর্ক রাখায় এবং অন্যান্য মিশনের সঙ্গে একযোগে প্রচেষ্টা না করায় এদের প্রচেষ্টা কয়েক বছরের মধ্যেই সংকুচিত হতে থাকে।[৪৩] সংকোচের আর একটি প্রধান কারণ বিদ্যালয়গুলি বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকায় তত্ত্বাবধান আশানুরূপ হতো না এবং শিক্ষার মানও সন্তোষজনক হয়নি। পট্‌স্‌ উল্লেখ করেছেন, "The efficiency of schools was not in an equal ratio with their extent; the plan was therefore contracted."[৪৪]

পরবর্তীকালে দেশে যখন ইংরাজী শিক্ষার ব্যাপক প্রয়াস সুরু হয় শ্রীরামপুর মিশনের পাশ্চাত্যধারার সংমিশ্রণে দেশীয় শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস তখন স্তিমিত হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ব্যাপকতা কমে আসে। গ্রামের অগণিত অবহেলিত মানুষের অজ্ঞতা ও অশিক্ষার অন্ধকার দূরীকরণের যে সূচনা করেছিল শ্রীরামপুর মিশন ভারতের শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয়। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থাতে নিজেদের নিঃশেষিত করে এঁরা এককভাবে যে বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার সমকক্ষ উদাহরণ ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরবর্তীকালের সকল শিক্ষা-

বিস্তারের প্রচেষ্টার ওপর এঁদের প্রভাব পরোক্ষভাবে যে পড়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারা বহন করে শ্রীরামপুর মিশনের যে প্রয়াস আজও অব্যাহত তা হলো শ্রীরামপুর কলেজের সুদীর্ঘ একশ পঁচাত্তর বৎসর ধরে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে অতুলনীয় অবদান। বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যায় এই কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক স্তর পর্যন্ত এবং খৃষ্টধর্মতত্ত্ব শিক্ষায় নিজস্ব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দান করে।

উল্লেখপঞ্জী

১. Chatterjee, S. : One hundred fifty years of Serampore College—pamphlet, pub. by Ter Jubilee Committee. Serampore College, 1968.

২. মিত্র, সুধীরকুমার : হুগলী জেলার ইতিহাস (৩য় খণ্ড)। ১৯৬৮, পৃঃ ১১৫৭

৩. ঐ ঐ পৃঃ ১১৫৭

৪. ঐ ঐ পৃঃ ১১৬০

৫. Marshman, J. C. : Life and Times of Carey, Marshman and Ward. Vol. I, 1859, p. 124

৬. Howels, George : The story of Serampore and its College. 1918, p. 1

৭. Do Do p. 3

৮. সিদ্দিক খান, মুহম্মদ : বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী যুগ। ১৯৬২, পৃঃ ৩০

৯. Marshman, J. C. : Life and Times of Carey, Marshman and Ward. Vol. 1, 1859, p. 19-20

১০. Laird, Michael : Missionaries and Education in Bengal. 1972, p. 71

১১. Potts, E. D. : British Baptist Missionaries in India. 1967, p. 115

১২. Do Do p. 116

১৩. Laird, Michael : The contributions of missionaries to education in Bengal during the administration of Lord Hastings'—published in Diamond Jubilee number of Bengal Past and Present. 1967, p. 84

১৪. Potts, E. D. : British Baptist Missionaries in India. 1967, p. 114

১৫. Serampore Mission : First Report on Native Schools. 1817, p. 41-42 .

১৬. Laird, Michael : Missionaries and Education in Bengal. 1972, p. 63-64

১৭. Marshman, J. C. : Life and Times of Carey, Marshman and Ward. Vol. 11, 1859, p. 82

১৮. Serampore Mission : Hints relative to Native Education. 1816, p. 8

১৯. Do Do p. 10

২০. Do Do p. 15

২১. Do Do p. 29

২২. Do Do p. 30

২৩. Ward, William : Letter to Captain Villers p. 28-29

২৪. Do Do Do

২৫. Serampore Mission : First Report on Native Schools. 1817 p. 4

২৬. Do Do p. 51

২৭. Laird, Michael : Missionaries and Education in Bengal. 1972, p. 65-66

২৮. Do Do p. 73-74

২৯. Serampore Mission : Second Report on Native School. 1818, appendix

৩০. Do First Report on Native Schools. 1817, p. 18-19

৩১. বাগল, যোগেশচন্দ্র : বাংলার স্ত্রীশিক্ষা। ১৯৫১, পৃঃ ২৫-২৬

৩২. ঐ ঐ পৃঃ ১১, ৪, ২৫, ১৯

৩৩. Laird, M. : Missionaries and Education in Bengal. 1972, p. 135

৩৪. Serampore Mission : Second Report of Native Schools. 1818, p. 47

৩৫. Stewart, Wilma : Story of Serampore and its College. 1961, appendix III

৩৬. Serampore Mission : Third Report of Native Schools. 1823, p. 2

৩৭. Potts, E. D. : British Baptist Missionaries in India. 1967, p. 131

৩৮. Serampore Mission : First Report of Native Schools. 1817, p. 13

৩৯. Do Do p. 7

৪০. Marshman, J. C. : Life and Times of Carey, Marshman and Ward. Vol. II, 1859, p. 259

৪১. Serampore Mission : Prospectus of Serampore College. July, 1818, p. 10

৪২. Do Second Report of Serampore College. 1821, p. 10

৪৩. Potts, E. D. : British Baptist Missionaries in India. 1967, p. 121

Laird, M. : Missionaries and Education in Bengal. 1972, p. 91

৪৪. Potts, E. D. : British Baptist Missionaries in India. 1967, p. 121

প্রসঙ্গ কলকাতা

১৬৯০ সালের ২৪শে আগষ্ট ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি গঙ্গার পূর্বতীরে সুতানুটীতে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করে কলকাতার পত্তন করেন বলে ইতিহাসবিদ্‌রা অভিমত দিয়েছেন। বিষয়টি অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ কিন্তু বিতর্কহীন নয়। কলকাতায় ইংরেজ-কুঠি স্থাপনের তিনশ বছর পূর্তি আখ্যা দিলে হয়ত বিতর্ক হত না, কলকাতার জন্ম বা সূচনা বললে অনেকের আপত্তি হবে, কারণ ইংরেজদের আসার আগে কলকাতা বর্ধিষ্ণু জনপদ হিসাবে সুপরিচিত ছিল। অতীতে কলকাতা ছোট গ্রাম ছিল বলে যে ধারণা তা সঠিক নয়। তাছাড়া ইংরেজ কোম্পানীর কুঠি স্থাপনের পরের দেড়শ বছরের ইতিহাস আমাদের কলঙ্কের, আমাদের লজ্জার—গৌরবের নয়। ইংরেজ-কুঠি স্থাপনের ঘটনাকে গর্বের সঙ্গে স্মরণীয় করার মাধ্যমে নিজেদের দীনতাই প্রকাশ করা হয়।

১৬৯০-এর আগে কলকাতা অনুল্লেখযোগ্য ছোট গ্রাম ছিল না। কলকাতা ছিল একটি সুপরিচিত জনপদ।[১] চার্ণক কলকাতায় প্রথম আসেন ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে। তার দশ বছর আগে কবি কৃষ্ণরাম দাস তাঁর কালিকামঙ্গল কাব্যে (১৬৭৬-৭৭) নিজের জন্মস্থানের সঙ্গে এই অঞ্চলের শুধু কলকাতার উল্লেখ করে লেখেন—

"ভাগীরথীর পূর্বতীরে অপুরুব নাম।
কলিকাতা বন্দিনু নিমিতা জন্মস্থান।"[২]

ছোট গ্রাম হলে কবি কি কলকাতাকে বন্দনা করতেন? তাঁর সমসাময়িক কবি সনাতন ঘোষাল উড়িষ্যার কটকে বসে লেখেন—

"কলিকাতা ঘোষাল বংশে কৃষ্ণানন্দ
তাঁর পুত্র ভুবনবিদিত রামচন্দ্র
তাঁহার মধ্যম পুত্র করি শিশুলীলা
ভাষাভাগবৎ বিদ্যাবাগীশ রচিলা।"[৩]

বিখ্যাত ঘোষাল বংশ ছিল ছোট গ্রামে নয়, সুপরিচিত কলকাতা জনপদে।

বিদেশী বণিকদের মধ্যে কলকাতায় প্রথম আসে আর্মেনীয়রা এবং তারাই কলকাতায় প্রথম বাণিজ্য-কুঠি তৈরী করে। আচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায় আর্মেনীয় চার্চের মধ্যে একটি সমাধিফলক পরীক্ষা করে বলেন যে, ফলকটি প্রসিদ্ধ আর্মেনীয় বণিক সুকিয়াসের স্ত্রী রেজাবিবির এবং তাঁর মৃত্যুর তারিখ ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দ।[৪] বিদেশী বণিকদের উপস্থিতিতে সে-সময় কলকাতা যে একটা বিশিষ্ট বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থাকার কথা নয়। এর আগেও

কলকাতার নাম অপরিচিত ছিল না। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রচিত হয় ১৫৯৪ থেকে ১৬২৪-এর মধ্যে। এই কাব্যে আছে—

"ধালিপাড়া মহাস্থান কলিকাতা কুচিস্থান
দুই কূলে বসাইয়া বাট।
পাষাণে রচিত ঘাট দুকূলে যাত্রীর নাট
কিঙ্করে বসায়ে নানা হাট।"[৫]

এর অনেক আগে বিপ্রদাস পিপলাই-এর কাব্যে (১৪৯৫-৯৬) কলকাতার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—

"পূর্ব্ব উপকূল বাহিয়া এড়ায়ে কলকাতা
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদ মহারথা।"[৬]

এঁরা সকলেই কলকাতার নাম বলেছেন, গোবিন্দপুর বা সুতানুটীর নাম করেননি। তাই কলকাতার সূচনা ১৬৯০-এ হয়নি। তবে ১৬৯০তে কী হয়েছে? হয়েছে ইংরেজ কোম্পানীর কলকাতায় স্থায়ী কুঠি স্থাপন আর ভারতে 'নয়া শোষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন'।

কোন কোন ইংরেজ মনীষীও জব চার্ণককে আধুনিক ইংরেজ কলকাতার রূপকার বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন ১৭৫৬-৫৭ সালেই আধুনিক কলকাতা নগরী সংগঠিত হয়েছে। ১৮৭৩ সালে সি. বি. লুইস লিখেছেন, "ব্ল্যাকহোলের দুর্ঘটনার (১৭৫৬) সময়েই আজকের কলকাতার পত্তন হয়েছে। এর আগে ১৬৯০-এ জব চার্ণক কলকাতায় ইংরেজ কুঠি স্থাপন করে এবং তাকে ঘিরে নগরীও গড়ে ওঠে। কিন্তু তার অল্প চিহ্নই দেখা যায়। বর্তমান নগরীটি গড়ে ওঠে ১৭৫৬ সালের পর।"[৭] জব চার্ণকের কলকাতাকে সিরাজদ্দৌলা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেন। ১৭৫৭তে ক্লাইভ কলকাতায় নতুন শোষণ কেন্দ্র গড়েন। তবু তখনও ইংরেজ বণিকদের সাম্রাজ্যলোভী হিংস্র মূর্তি প্রকাশ পায়নি, তা দেখা যায় ১৭৬৫ সালে কোম্পানী দেওয়ানীর ভার নেবার পর। কলকাতাকে স্থায়ী শাসন ও শোষণ কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার উদ্যোগ তখন থেকেই সুরু হয় এবং পরবর্তীকালে যে-কলকাতা দেখা যায় তার যাত্রা শুরু হয়েছে ১৭৬৫ সালে।

আঠারো শতকের শেষার্ধের ইতিহাসের পাতায় রক্তাক্ত অক্ষরে লেখা আছে কলকাতাকেন্দ্রিক ইংরেজ কোম্পানীর নৃশংস অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ আর বাংলার ঐশ্বর্য লুণ্ঠনের মর্মন্তুদ কাহিনী। মহামনীষী কার্ল মার্কস বৃটিশ শোষণের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, "বৃটিশেরা হিন্দুস্থানের ওপর যে দুর্দশা চাপিয়েছে তা হিন্দুস্থানের আগের দুর্দশার চাইতে মূলগতভাবে পৃথক এবং অনেক বেশী তীব্র। বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এশীয় স্বৈরাচারের ওপর ইউরোপীয় স্বৈরাচারের পত্তন ঘটিয়ে এমন এক দানবীয় জরাসন্ধ সৃষ্টি

করেছে যে তা সলসেট মন্দিরের রোমহর্ষক স্বর্গীয় দানবদের চাইতে বেশী দানবীয়।"[৮] মহামনীষী মার্কস বৃটিশ অত্যাচারের প্রকৃতি ও বিপুলতা সঠিকভাবে অনুধাবন করেছেন। তাই অত্যাচারী কলকাতার মাথায় ৩০০ বছরের গৌরবের মুকুট পরানো যায় না।

মেহনতী মানুষের ওপর কলকাতার ইংরেজ বণিকদের আর তাদের দেশীয় মোসাহেবদের অত্যাচারের মাত্রা এমনভাবে বৃদ্ধি পায় যে পলাশীর যুদ্ধের পর বারো বছরের মধ্যেই দেশে দেখা যায় ভয়ঙ্কর মন্বন্তর (১৭৭০)। এই মন্বন্তরে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ নিঃশেষিত হয়ে যায়, যারা বেঁচে থাকে তাদের অধিকাংশই অনাহারে-অর্ধাহারে পঙ্গু হয়ে যায়। মন্বন্তরের ঠিক আগেই ইংরেজদের অত্যাচারের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে ১৭৬৯ সালে কোম্পানীর মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট লেখেন, "ইংরেজ মাত্রেরই একথা মনে করতে কষ্ট হবে যে কোম্পানী ভারতের দেওয়ানী লাভের পর এদেশের লোকের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক খারাপ হয়েছে। এটা যে সত্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই সুন্দর দেশে স্বেচ্ছাচারী রাজাদের অধীনেও স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ ছিল। যখন এর শাসনভার ইংরেজদের হাতে আসে, তখন থেকেই দেশ ধ্বংসের পথে যাচ্ছে। আগে এদেশের লোক স্বাধীনভাবে ব্যবসা করত, তখন তাদের ঐশ্বর্য ও সম্পদ ছিল। এদের ধ্বংসের অবস্থা দেখে আমি খুবই দুঃখিত।[৯] দেশের অবস্থা তখন এতই শোচনীয় যে কোম্পানীর নিজের লোকের মনেও অনুশোচনা জেগেছে। গ্রামের লক্ষ লক্ষ লোক যখন অনাহার-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে, তখন তাদেরই অর্থে কলকাতায় তৈরী হচ্ছে গগনচুম্বী প্রাসাদ। নিরন্ন চাষীর মুখের গ্রাস কেড়ে নগরীতে আনন্দের ফোয়ারা ছুটছে। আঠোরো শতকের এই মর্মন্তুদ অবস্থার বর্ণনা করার সময় কলকাতার কথা ভাবা হয় না, আর কলকাতার কথা বলার সময় দেশের কথা মনে থাকে না। কিন্তু ভাঙ্গাগড়া একই সঙ্গে হয়েছে। ১৭৮৭ সালে বৃটিশ পার্লামেণ্টের একজন দায়িত্বশীল সদস্য মিঃ ফুলারটন বলেন, "আগে বাংলা ছিল সকল জাতির শস্যের ভাণ্ডার, আর প্রাচ্যের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। কিন্তু আমাদের অতিরিক্ত কুশাসনের ফলে গত বিশ বছরের মধ্যে এই দেশের অনেক স্থান মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। অনেক চাষের স্থান হয়েছে জঙ্গল, কৃষকের ধন লুণ্ঠিত, শিল্পীরা হয়েছে উৎপীড়িত।"[১০] আর কলকাতায় চলেছে তখন উচ্ছৃংখলতার জোয়ার। ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী জন টমাস ১৭৮২-৮৩ সালে জাহাজের ডাক্তার হিসাবে কলকাতায় আসেন। কলকাতার বেলেল্লাপনা দেখে তিনি তাজ্জব হয়ে যান। কলকাতার ইউরোপীয় সমাজের নৈতিক শৈথিল্যের জন্যই তিনি পরে কেরীকে নিয়ে এদেশে আসেন খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য। কলকাতা তখন বল্গাহীন ভোগবিলাসের কেন্দ্র। এর রসদ জোগাবার সুচতুর পরিকল্পনা করে কোম্পানী। দীর্ঘকাল অত্যাচার ও নিপীড়ন

সহ্য করেও গ্রামগুলি অর্থনৈতিক কাঠামোকে অটুট রেখেছিল, কারণ গ্রাম্য জমিদারেরা ছিলেন এর রক্ষক এবং জমিদারেরা গ্রামে থাকতেন বলে গ্রাম্য অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তাঁদের ছিল প্রত্যক্ষ সংযোগ। ফলে গ্রামের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রভৃতি অত্যাচার ও লুণ্ঠনের আঘাত কমজোরি হলেও একেবারে বিনষ্ট হয়নি। বাংলার কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা তখনও বহির্ভারতে কমেনি। ফলে দেশের লোককে ইংরেজ কোম্পানী পুরোপুরি ভিখারীতে পরিণত করতে পারেনি। ১৭৯২ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নাম দিয়ে কর্নওয়ালিস গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গার উদ্যোগ নেন। তিনি বনেদী জমিদারদের সরিয়ে কলকাতার ফড়িয়াবাবুদের জমিদারী কেনবার সুযোগ করে দেন এবং তাদের উৎসাহ দেন জমিতে অর্থ লগ্নী করতে। বিলাসের মধ্যে ডুবে থাকা এই সব হঠাৎ-রাজারা বিনা পরিশ্রমে অর্থাগমের এই সহজ রাস্তাটা ধরে নিতে ইতস্ততঃ করেনি।

গ্রামের চাষীদের মুখের-রক্ত-তোলা অর্থে কলকাতার রাজা, মহারাজা, প্রিন্স, আর বাবু জমিদারদের চলে স্ফূর্তির ফোয়ারা, চতুর ইংরেজ বেনিয়ানরা সেই স্ফূর্তিতে যোগ দিয়ে পিঠ চাপড়ায় রাজা-মহারাজাদের। ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামো পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ে। ধানের জমিতে ইংরেজ বেনিয়ান আর তাদের দালালরা জোর করে নীল চাষ করায়; বস্ত্রশিল্প, ধাতুশিল্প, যন্ত্রশিল্প বন্ধ হতে থাকে। অজ্ঞতা আর কুসংস্কার দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। দেশের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই হঠাৎ-রাজা-মহারাজাদের ভূমিকা যথোচিত পর্যালোচিত না হওয়ায় সে যুগের দেশীয় সমাজের ওপর সব দোষ ও দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কলকাতা গড়ার জন্য সারা দেশকে কিভাবে শোষণ করা হয়েছে তার চিত্র আজও ফুটিয়ে তোলা হয়নি।

নয়া শোষণের স্থায়ী কেন্দ্র হয় কলকাতা ১৭৭৪ সালে, যখন ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতাকে বৃটিশ ভারতের রাজধানী করেন। নয়া বুর্জোয়া সভ্যতা ও বণিক শক্তির প্রতীক কলকাতা, তার সর্বাঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক চিহ্ন। জীবন-যাত্রায়, চরিত্রে, সংস্কৃতিতে—সর্বকিছুতেই সামন্ততান্ত্রিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে। গ্রাম থেকে আসা মানুষের সবকিছুই পাল্টে যায় দুদিনে। গ্রাম থেকে আসা মানুষ কলকাতার অধিবাসী হয়ে গ্রামকে এমনভাবে উপেক্ষা করতে থাকে যে মনে হয় গ্রামের সঙ্গে তাদের কোনদিন সম্পর্ক ছিল না। এই সঙ্গে কলকাতায় শুরু হয় ইংরেজ নবাবী। আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত (অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত) এই শত বছর ছিল ইংরেজ নবাব ও তার মোসাহেবদের স্বর্ণ যুগ।[১১] কলকাতায় ভীড় করা হঠাৎ-রাজাদের নিয়ে কলকাতার ধনতান্ত্রিক সভ্যতার

বিকাশ ঘটে, আর নবাবী সংস্কৃতি রূপ নেয় বাবু সংস্কৃতিতে। গ্রামশোষা অর্থে বিলাসিতার স্রোত বয়ে যায় রাজা, মহারাজা আর বাবুদের বাড়ীতে। সাহেব নবাবদের বাড়ীতে যেমন ভোজ ও বাইজীর নাচ চলে, তেমনি আত্মীয়-সভা ও ধর্মসভার গোষ্ঠীভুক্ত বাবুদের বাগানবাড়ীতেও বসে নাচ-গানের আসর। রাজা রামমোহনের বাড়ীতে, প্রিন্স দ্বারকানাথের বাগানবাড়ীতে, রাজা রাধাকান্ত দেবের গৃহে, মহারাজা সুখময় রায়ের বাড়ীতে, গোপীমোহন দেবের বাড়ীতে, বেনিয়ান বারানসী ঘোষের বাড়ীতে চলে মদ খাওয়া, বাইজীর নাচ, আর আতসবাজী পোড়ানোর বল্গাহীন, কুৎসিত প্রতিযোগিতা—আর তার রসদ জুগিয়ে চলে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মেহনতী মানুষ।[১২]

সন্ধ্যা হলেই নগর কলকাতা নরক কলকাতায় রূপান্তরিত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪৬ সালের ৩৬ সংখ্যায় লেখে, "সন্ধ্যার পর নগর মধ্যে পাপের মহোৎসব উপস্থিত। কোন স্থানে বহু ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া গণিকার গৃহে প্রবেশ করিতেছে, কুত্রাপি কোন বাবুর অনাচারের সাক্ষীস্বরূপ অশ্ববান তাহার রক্ষিতার দ্বারে স্থাপিত রহিয়াছে; কোন কোন বেশ্যার আলয় হইতে মাদকোন্মত্তসমূহ লম্পটের উল্লাস-কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে, কুত্রাপি গণিকার অধিকারের জন্য বিমোহিত পুরুষেরা বিবাদ কলহ সংগ্রামে প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইতেছে।"[১৩] জব চার্ণকের কলকাতার সংস্কৃতি ছিল এইরূপ, এর জন্য নিশ্চয়ই গর্ব করা যায় না।

কলকাতার অভিজাত বা বনেদী সম্প্রদায় যাঁরা গঠন করেন, তাঁদের অনেকেই পুরনো জমিদার বা বনেদী বংশের সন্তান ছিলেন না। ইংরেজ কোম্পানীর অত্যাচার ও লুণ্ঠনে সহযোগিতা করে এঁরা প্রভূত অর্থ লাভ করে রাতারাতি ধনী হয়ে যান। রামমোহন জন ডিগবীর দেওয়ানরূপে তাঁকে অর্থ শোষণে সাহায্য করে অনেক টাকা রোজগার করেন, তারপর কোম্পানীর কর্মচারীদের চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে বিরাট ধনী হয়ে যান এবং বড় বড় তালুক কিনে কলকাতার সমাজে জমিদাররূপে অভিজাত শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হন। টাকা রোজগারের সময় যেমন ভাবেননি দেশের গরীব চাষীদের শোষণের অংশীদার তিনি, তেমনি জমিদাররূপে প্রজাদের দুঃখকষ্টের ভার লাঘবের চেষ্টাও করেননি। দ্বারকানাথের প্রপিতামহ জয়রাম ফোর্ট উইলিয়াম তৈরীর কাজে যুক্ত থেকে বিত্তশালী হন। তাঁর ছেলে নীলমণি উড়িষ্যায় সেরেস্তাদারের কাজে উপায় করেন প্রভূত অর্থ। তিনি কলকাতায় ভুসম্পত্তি কিনে কলকাতার ধনী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হন। তাঁর নাতি দ্বারকানাথ ইংরেজ ব্যবসায়ীদের অংশীদার হয়ে 'প্রিন্স' উপাধিতে ভুষিত হন এবং দেশের কুটীর শিল্প ধ্বংসে প্রথম ভারতীয়রূপে সহযোগিতা করেন। পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যান।

হেস্টিংসের মোসাহেব কান্তবাবু কোম্পানীর প্রসাদ হিসাবে পান নাটোরের জমিদারী এবং প্রজাপীড়নের টাকায় এই বংশের জমিদাররা কলকাতায় বিলাসের জোয়ার বইয়ে দেয়। ক্লাইভের কুকীর্তির সহায়ক নবকৃষ্ণকে কোম্পানী মহারাজা করে দেয় এবং তাঁর বংশধরেরা হন কোম্পানীর বড় সাহায্যকারী। কলকাতার প্রায় সব 'বড় বংশই' একই রকমভাবে কোম্পানীর প্রসাদপুষ্ট হয়ে ধন লাভ করেছে আর দেশ শোষণে হয়েছে কোম্পানীর সবচেয়ে বড় সহায়। দেশের ঐশ্বর্য লুন্ঠন করে এদের সাহায্যেই বিলাসবহুল প্রাসাদপুরী কলকাতা গড়ে ওঠে। ইম্পের দেওয়ান পোস্তার রাজা সুখময় রায়, ভ্যান্সিটার্টের দেওয়ান আঁদুলের রাজা রামচরণ রায়, ভেরেলেষ্টের বেনিয়ান খিদিরপুরের রাজা গোকুলচন্দ্র ঘোষাল, টমাস রামবোল্ডের দেওয়ান জোড়াসাঁকোর রাজা শান্তিরাম সিংহ, কুমোরটুলীর গোবিন্দরাম মিত্র, জোড়াবাগানের রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, কলুটোলার রামকমল সেন, জোড়াসাঁকোর অভয়চরণ ঘোষ, হাটখোলার রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতিরা অত্যাচারী ইংরেজ রাজপুরুষদের দেশ শোষণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হন। এঁরা ছাড়া কোম্পানীর বড় হাতিয়াররূপে বিখ্যাত হন বারানসী ঘোষ, হৃদয়রাম ব্যানার্জী, অক্রুর দত্ত, নিমাইচরণ মল্লিক, মনোহর মুখার্জী, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি অনেকে।[১৪] এঁরাই দেশকে ঘৃণা আর ইংরেজকে পুজোর প্রবর্তন করেন সারা ভারতে।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নববাবু বিলাস'-এ লিখেছেন, "এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার, বর্ণকার, কর্মকার, চর্মকার, চটকার, পটকার, শঠকার বেতনোপভুক হইয়া কিংবা রাজের, সাজের, কাঠের, খাটের, মঠের, ইটের সরদারি, চৌকিদারি, জুয়াচুরী, পোদ্দারী করিয়া কিঞ্চিত অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানীর কাগজ কিংবা জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।"[১৫] এইসব হঠাৎ-রাজারা জমি ছাড়া অন্য কিছুতে অর্থ নিয়োগ করতে অনুমতি পাননি ও অনুমতি ছাড়া কিছু করার কথা তাঁরা চিন্তা করতেও পারেননি; শুধু বিলাসব্যসনে দু'হাতে টাকা ওড়ানোয় সাহেবদের উৎসাহ ও সহযোগিতা পান। ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্য এঁদের সাহায্যে খুব সহজেই এদেশে প্রচলিত হয়ে যায়, আর ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায় দেশীয় শিল্পসমূহ। এদেশের টাকা বিদেশে পাঠাবার সহজ উপায় করে দেন কলকাতার বাবুরা। কর্ণওয়ালিশ বনেদী জমিদারদের তাড়িয়ে কলকাতার ফড়িয়া ব্যবসায়ীদের হাতে বাংলার জমিদারি তুলে দেবার পর থেকে শুরু হয় চাষীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার। একদিকে কৃষির অবস্থা যেমন খারাপ হতে থাকে, অপরদিকে পৃথিবী বিখ্যাত বাংলার কুটীর শিল্পগুলির অবস্থাও হয় শোচনীয়। জমিদারের অর্থানুকুল্যের অভাবে পাঠশালা, টোল, চতুষ্পাঠী, মাদ্রাসা উঠে যায়। গ্রামাঞ্চলে

নিরক্ষরতা দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। গ্রামের সংস্কৃতির মান হয় নিম্নগামী। অসামাজিক শক্তি মাথা তোলার সুযোগ পেয়ে কুসংস্কারের ব্যাপক প্রচার করে সমাজের সর্বস্তরে। বাংলার হাজার হাজার গ্রাম যখন দারিদ্র্য, অজ্ঞতা আর কুসংস্কারে ডুবে যাচ্ছে, তখন প্রাসাদপুরী কলকাতা আলো ঝলমল হয়ে উঠছে।

ইংরেজ কোম্পানীর কাছে কলকাতার বাবুরা ছিলেন এমন বশংবদ যে কোম্পানীর অত্যাচারের দিকে সহজেই মুখ ফিরিয়ে থেকে তাঁরা তাত্ত্বিক বিতর্কে মশগুল থাকতেন। উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কলকাতার সমাজের চিন্তাধারায় ছিল নানাভাবে ইংরেজ কোম্পানীকে তোষণের প্রয়াস ; স্বদেশপ্রীতি বা জাতীয়তাবোধ বিন্দুমাত্র ছিল না। উগ্র ব্যক্তিস্বার্থ-চেতনাই ছিল কলকাতার সমাজকে ঘিরে। ইংরেজ কোম্পানী যে ১৬৯০ সালে কলকাতা-কুঠি পত্তন করে সেই কোম্পানীই তৈরী করে সমাজ। সারা দেশ কিন্তু এর জন্য গৌরব বোধ করতে পারে না।

উনিশ শতকের শেষার্ধে সমাজসংস্কার ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়েই প্রথম সমগ্র দেশকে জাগ্রত করার প্রয়াসে কলকাতা নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে এবং শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতেই জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা শুরু হয়। তবু এ সময়েও শোষণে জর্জরিত গ্রাম-সমাজের প্রতি কলকাতার নিষ্করুণ অবহেলা কমেনি, বরং বেড়েই চলে। শিক্ষা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে বিশ শতকের প্রথম দিকে কলকাতা ভারতকে পথ দেখালেও, বাংলার গ্রাম, এমনকি কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলের গ্রামও ছিল দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কলকাতা যত এগিয়েছে গ্রাম তত পেছিয়েছে।

পরিশেষে যেটা বলা প্রয়োজন তা হল, কলকাতা অবশ্যই আমাদের গর্বের বস্তু, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের শোষণ-লুণ্ঠনের কেন্দ্র যে-কলকাতা, সেই কলকাতা আমাদের গর্বের নয়, আমাদের গর্ব হল সেই কলকাতা যা সাম্রাজ্য-বাদী শোষণ-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে বার বার গর্জে উঠেছে। তাই "কলকাতার তিনশ বছর পূর্তির" ধ্বনি তুলে ইংরেজের শোষণ-লুণ্ঠনের তিনশ বছর পূর্তিকে স্মরণীয় করার জন্য সমারোহপূর্ণ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা দেখে সচেতন মানুষের মন লজ্জায় ভরে উঠেছে।

উল্লেখপঞ্জী

১. মুখোপাধ্যায়, সুখময় : ইংরেজ পূর্বযুগের কলিকাতা। ঐতিহাসিক, জুলাই, ১৯৭৮, পৃঃ ১

২. ঐ পৃঃ ৪

৩. ঐ পৃঃ ৫

৪. ঐ পৃঃ ৬

৫. ঐ পৃঃ ৬

৬. ঐ পৃঃ ৮

৭. লুইস, সি. বি. : লাইফ্ অফ্ জন টমাস। ১৮৭৩, পৃঃ ১৫

৮. কার্ল মার্কস্ : ভারতে বৃটিশ শাসন ; প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ গ্রন্থে সংকলিত। পৃঃ ১৫

৯. মজুমদার, রমেশচন্দ্র : বাংলা দেশের ইতিহাস (৩য়) গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃঃ ৩৯১

১০. ঐ পৃঃ ৩৯২

১১. ভট্টাচার্য, কুমুদকুমার : উনিশ শতকের প্রথম পর্ব। দিগ্‌দর্শন, অক্টোবর, ১৯৭৬ পৃঃ ৪

১২. ঐ পৃঃ ৬

১৩. ঐ পৃঃ ৭

১৪. ঐ পৃঃ ৯-১০

১৫. ঐ পৃঃ ১১

শ্রীরামপুর সঞ্চয় ব্যাঙ্ক

উনিশ শতকের সূচনায় একটি মহৎ প্রয়াস

ঊনিশ শতক বাংলার জনজীবনে সর্বাত্মক পরিবর্তন সূচনা করে। এই সূচনার ইতিহাস গঠনে ডাঃ উইলিয়াম কেরী ও শ্রীরামপুর মিশনের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। খৃষ্টধর্ম প্রচার ও ধর্মান্তিকরণের উদ্দেশ্য নিয়ে কেরী এদেশে আসেন, কিন্তু জীবন উৎসর্গ করে যান এদেশের কলাাণের জন্য। শ্রদ্ধেয় এন. কে. সিংহ বলেছেন, "শ্রীরামপুর ঠিক Christian Benaras হয়নি। যা হয়তো মিশন প্রথমে আশা করেছিলেন। কিন্তু কেরী ও তাঁর পরিজন দেখিয়েছেন যে যখন অধিকাংশ ইংরেজ শুধু অর্থের লোভে আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসেছিল, আর ইংরাজ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য সব সময় উদগ্রীব ছিল, সে সময় কেউ কেউ প্রমাণ করেছিলেন যে মহান আদর্শ তাঁদের ছিল।"[১] কেনেথ ইঙ্গহাম বলেছেন, "খৃষ্ট ধর্মান্তিকরণের সংখ্যা অপেক্ষাকৃতভাবে অল্প, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে মিশনারীদের প্রভাব ছিল অনেক বেশী।"[২] খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এঁদের সব কল্যাণমূলক কাজই স্বাভাবিকভাবে এই আধার হতে উৎসারিত। সেজন্য এঁদের সব কাজকেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে ধরলে অপক্ষপাত মূল্যায়ন করা যায় না। এঁদের কাজ জনসাধারণের কতটা মঙ্গল করেছে এবং পরবর্তী কালের সমাজ-গঠনে কতটা সহায়তা করেছে তারই ওপর এই মূল্যায়ন সম্ভব। এ সম্পর্কে কেশবচন্দ্র সেন বলেছেন, "খৃষ্টান মিশনারীগণ ভারতে মানব কল্যাণমূলক যে-সব মহৎ কাজে আত্মোৎসর্গ করে গেছেন এবং সামাজিক, নৈতিক ও জ্ঞানোন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নতির যা করেছেন তার জন্য বিশেষ স্তুতির প্রয়োজন নেই, তা জাতির অন্তরে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সঞ্চিত আছে।"[৩] সমসাময়িককালে রামমোহন রায়ও মিশনারীদের কল্যাণমূলক কাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে অনেকে মনে করেন।[৪] এদেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই সংস্কার, পরিবর্তন ও উন্নয়নের সূচনা হয় এই মিশনের আলয়ে এবং কাজের মধ্য দিয়েই প্রমাণ হয়েছে যে এদেশীয়দের কল্যাণ সাধন করা এঁদের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে জে. সি. মার্শম্যান বলেছেন, "শ্রীরামপুর মিশনারীরা দেশীয় লোকের দুর্দশা দূর করা এবং তাদের কল্যাণ সাধনের সর্বতোভাবে চেষ্টা করা তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করতেন।"[৫]

মিশনের কল্যাণমূলক কাজগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়। (১) অজ্ঞতা দূর করা, (২) শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তা বোধের বীজ বপন করা, (৩) সামাজিক অত্যাচার প্রতিরোধ করা (৪) দেশীয় শিল্পকে আধুনিকীকরণে

উদ্বুদ্ধ করা, (৫) রোগ নিরাময় ও স্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টা করা, (৬) দারিদ্র্য দূর করা, (৭) কৃষি ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উন্নতি করা ও (৮) বনজ সম্পদ সংরক্ষণে সচেতন করা। নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার দ্বারা প্রতিটি ক্ষেত্রে এঁরা পথপ্রদর্শক সূচনাকারী হিসাবে বিস্ময়করভাবে সফল হন, কিন্তু নানা কারণে এঁদের অনেক কাজই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ইঙ্গহাম বলেছেন, "দরিদ্র ভারতীয়দের জন্য মিশনারীদের অন্তর গভীরভাবে উদ্বেলিত হলেও, তাদের সংখ্যাল্পতা ও সীমিত আর্থিক সঙ্গতির জন্য এদের দুর্দশা দূর করার কোন ব্যাপক প্রয়াস এঁরা করে উঠতে পারেননি।"[৬] শ্রীরামপুর মিশনারীদের কল্যাণমূলক প্রয়াসগুলির সবচেয়ে স্বল্পস্থায়ী ছিল আর্থিক দুরবস্থা দূর করার প্রকল্প সঞ্চয় ব্যাঙ্ক স্থাপন ও পরিচালনা। ভারতে এইরূপ প্রচেষ্টা শ্রীরামপুর মিশনই প্রথম করে এবং এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নেরও উনিশ শতকে এইটি প্রথম প্রচেষ্টা।

অভাবের সঙ্গে সংগ্রামে রত পরিবারের সন্তান উইলিয়াম কেরী এদেশের বিপুল প্রাচুর্যের মধ্যে প্রচণ্ড দারিদ্র্যের রূপ দেখে বিস্মিত ও বিচলিত হন। মদনাবতীতে নীলকুঠির ম্যানেজার থাকার সময়ে (১৭৯৪-৯৯) তিনি গভীর ক্ষোভের সঙ্গে গরীব চাষীদের দুর্দশা ও তাদের ওপর অত্যাচার লক্ষ্য করেন। এ-সময়েই তিনি উপলব্ধি করেন কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল কৃষি উৎপাদনের গুণগত ও পরিমাণগত বৃদ্ধির ওপর। এই বৃদ্ধির জন্য যেমন দরকার কৃষি বিজ্ঞানের উন্নতি ঠিক তেমনি প্রয়োজন দরিদ্র কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি। তাই এইদিকে সকলের সচেতন দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এদেশে কৃষি, উদ্ভিদ ও বনজ বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত করান। কিন্তু অনুকূল পরিবেশের অভাব ও আর্থিক সঙ্গতির সীমাবদ্ধতার জন্য কৃষকদের আর্থিক উন্নতির কোন সক্রিয় প্রচেষ্টা তিনি করতে পারেননি। তবে এদিকে সকলের সচেতন দৃষ্টি আকর্ষণের তিনি চেষ্টা করেন।

তিনি বলেন, "দিনাজপুর জেলার সাধারণ লোক ভীষণভাবে দরিদ্র এবং সেজন্য এখানকার চাষীদের চাষের যন্ত্রপাতিও খুব সাধারণ ও অতি শোচনীয় অবস্থার। এদের দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও আলস্যের জন্যই কৃষিকার্যের উন্নতি হয় না। যদি এইগুলি দূরীকরণের কোন উপযুক্ত উপায় করা যায়, তবে এখানকার কৃষির প্রভূত উন্নতি করা সম্ভব।"[৭]

অভাবের তাড়নায় জর্জরিত দরিদ্রদের সাহায্য করার ইচ্ছা তিনি সব সময়েই পোষণ করতেন। সঞ্চয় ব্যাঙ্ক দরিদ্রদের সাহায্য করবে জেনেই তিনি এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হন। এই ব্যাঙ্কের আদর্শ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে এই প্রত্যাশা তিনি বিশেষভাবে করেছিলেন।

আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ধারায় ব্যাঙ্কের সূচনা ১৭৭০ সালে হলেও[৮] দেশীয় শেঠ, পোদ্দার ও মহাজনদের প্রভাব এদেশের অর্থনৈতিক

অবস্থাকে বহুদিন পর্যন্ত পরিচালিত করে। প্রাচীনকাল থেকে এঁরাই এদেশে আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করে এসেছিলেন। সমাজে এঁরা বিশেষ সম্ভ্রান্ত বলে পরিগণিত ছিলেন এবং রাষ্ট্রশাসনের ক্ষেত্রেও এঁদের বিশেষ প্রভাব ছিল। এরূপ দেশীয় ব্যাঙ্কারদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।[৯] প্রথমে নগরের শেঠ, পোদ্দার প্রভৃতি মহাজন। এঁদের মধ্যে যাঁরা প্রভুত বিত্তশালী ছিলেন তাঁরা বহির্বাণিজ্য, অন্তর্বাণিজ্য, রাষ্ট্রশাসন প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই টাকা খাটাতেন। দ্বিতীয়, জেলা পর্যায়ে ছিল বড় মহাজন। দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি এঁদের টাকার ওপর নির্ভরশীল ছিল। তৃতীয় পর্যায়ে ছিল গ্রামের ছোট মহাজন। ছোটখাটো ব্যবসায়ে টাকা খাটানো ছাড়া এঁরা চাষবাসের কাজে বিশেষভাবে টাকা খাটাতেন। জমিজমা, বাড়ীঘর, জিনিষপত্র বন্ধক নিয়ে চড়া সুদে গরীব চাষী ও অন্যান্যদের টাকা ধার দিতেন। ছোট মহাজনের সংখ্যা ছিল প্রচুর। সচ্ছল অবস্থাপন্ন অনেক গৃহস্থই এই মহাজনী ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। দেশের কৃষিশিল্পকে বিনাশ করতে এবং গ্রামবাংলার দুঃখ-দুর্দশা বাড়াতে অর্থপিশাচ মহাজনদের ভূমিকা ছিল বিরাট ও ব্যাপক। এদের হাত থেকে গরীবদের বাঁচাবার কোন চেষ্টাই সে যুগে হয়নি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশের শাসনভার হাতে নিয়েই ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক চালু করেনি। প্রথমদিকে তারা এজেণ্ট হাউসের মাধ্যমেই কাজ চালাতো। ১৭৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইউরোপীয় ব্যাঙ্কের নাম হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক। এটি আলেকজাণ্ডার এণ্ড কোং নামে একটি প্রতিষ্ঠানের অংশরূপে স্থাপিত হয়। এরপর ১৭৯০ সালে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এবং ১৭৯৩ সালে কর্ণাটকে কার্নাটিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এইগুলি প্রধানতঃ ইউরোপীয়দের সাহায্য করতো। ১৮০৬ সালে সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল স্থায়ী ব্যাঙ্ক হিসাবে উনিশ শতকের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।[১০]

কিন্তু এসব ব্যাঙ্ক বা সরকারের কোন পরিকল্পনাই ছিল না দেশের কৃষি-শিল্পকে উন্নত করার বা দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা। কৃষিপ্রধান দেশে ব্যাঙ্ক কৃষির উন্নতির জন্য অনেক বড় ভূমিকা নিতে পারতো অন্তত দরিদ্র কৃষকদের মহাজন ঘাতকের হাত থেকে কিছুটা বাঁচাতে পারতো। কিন্তু এসব ব্যাঙ্ক সে চেষ্টা করেনি। বরং পরোক্ষভাবে মহাজনদেরই সাহায্য করেছে। কোম্পানীর ভূমি সংক্রান্ত নানা নীতি এবং মহাজনদের অপ্রতিহত অত্যাচার ভূমিবঞ্চিত কৃষকের দুঃখ বিপুল পরিমাণে বাড়ায় এবং দেশীয় শিল্পসমূহের ওপর কঠিন আঘাত হানে। এ যুগে গ্রামবাসীর দুঃখ কষ্ট বেড়েই যায়, মোটেই কমে না। গ্রামবাংলার প্রতি অবহেলা কেরী গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। কিন্তু এদের সাহায্য করার সঙ্গতি তাঁর বা তাঁর মিশনের ছিল না। তাই এদের আত্মসচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনা গ্রহণ

করেন। কিন্তু এদের আর্থিক দুর্গতির কথা তিনি কখনই ভোলেন নি। তাই এডিনবরা রিভিয়ুতে গরীবদের জন্য সঞ্চয় ব্যাঙ্কের কথা পড়ে তিনি খুব উৎসাহিত হন এবং এদেশের পক্ষে এর উপযোগিতা বোঝাবার জন্য নিজেদের সীমিত পরিবেশে একটি ছোট আকারের সঞ্চয় ব্যাঙ্ক খোলার কথা চিন্তা করেন।

সঞ্চয় ব্যাঙ্কের উদ্ভব হয় চার্চ অফ্ স্কটল্যাণ্ডের রেভারেণ্ড ডানকানের চেষ্টায় ১৮১৪-১৫ সালে।[১১] এ-সময় এই ব্যাঙ্ক এডিনবরা ও অন্যান্য নগরে ছড়িয়ে পড়ে।

স্কটল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে এই ব্যাঙ্কের প্রসার দেখে এডিনবরা রিভিয়ু বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করে।[১২] কেরী ও তাঁর সহকর্মীরা সঞ্চয় ব্যাঙ্ক এদেশের পক্ষে খুব উপযোগী বুঝেও প্রকল্পটির ব্যাপক রূপায়ণে অগ্রসর হতে ইতস্ততঃ করেন, কারণ এ-সময় তাঁদের ওপর আর্থিক দায়িত্বের চাপ ছিল খুব বেশী। তাছাড়া নির্ভরযোগ্য সক্রিয় সহযোগীর অপ্রতুলতাও তাঁদের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক ছিল। কোন কোন মিশনারী বরং অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।[১৩] এজন্যই বোধ হয় তাঁরা সীমিত আকারের সঞ্চয় ব্যাঙ্ক খোলেন, উদ্দেশ্য ছিল কিছু সম্প্রদায়ের দরিদ্রদের সাহায্য করা এবং এর উপযোগিতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

১৮১৯ সালের ১লা মার্চ শ্রীরামপুরে এই সঞ্চয় ব্যাঙ্ক খোলা হয়। এরূপ ব্যাঙ্ক ভারতে এইটিই প্রথম। ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জন ক্লার্ক মার্শম্যান বলেন, "দেশীয়দের মধ্যে বিশেষ করে দেশীয় খৃষ্টানদের মধ্যে পরিশ্রমপ্রিয়তা এবং মিতব্যয় ও সঞ্চয়ের অভ্যাস বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই ব্যাঙ্কের সৃষ্টি।"[১৪] এই ব্যাঙ্কটির নাম দেওয়া হয় Bank of Savings (সঞ্চয়ার্থ ব্যাঙ্ক)। ১৮১৯ সালের ৩রা এপ্রিলের সংখ্যায় সমাচার দর্পণ এই ব্যাঙ্কের পরিচালনার নীতির নিম্নলিখিত বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে[১৫]—

"শ্রীরামপুর সঞ্চয়ার্থ ব্যাঙ্ক।—১ দফা। ১ মার্চ ১৮১৯ সালে সঞ্চিত টাকা নির্ভাবনাতে ন্যস্ত করিবার নিমিত্ত যে ব্যাঙ্ক শ্রীরামপুরে স্থির হইয়াছে তাহাতে কোন ব্যক্তি রবিবার ব্যতিরিক্ত সপ্তাহের কোন দিনে একটাকা পর্যন্ত রাখিতে পারে কিন্তু একটাকার ন্যূন কিম্বা ভাঙ্গাটাকা রাখা যাইবে না।

২ দফা। এই ব্যাঙ্কে যত টাকা ন্যস্ত হয় তাহার সুদ দেওয়া যাইবে। কোম্পানীর কাগজের উপরে যে সুদ পাওয়া যায় তাহার কম সুদ দেওয়া যাইবে না। এবং শতকরা নয় টাকার হিসাবের বাড়া সুদ দেওয়া যাইবেক না কিন্তু বাজার ভাওতে সুদের কম বেশী প্রযুক্ত গত বৎসরের টাকার সুদ যে ভাও দেওয়া যাইবেক তাহা প্রতি বৎসর ৩০ এফ্রেলে প্রকাশ হইবেক।

৩ দফা। টাকা ন্যস্ত করিবার সময়ে কোন ব্যক্তি হইতে কোন প্রিমিয়ম কিছু

লওয়া যাইবেক না এবং যে ব্যক্তি কোন মাসের ১৫ তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে টাকা রাখে তাহার সুদ তাহার পর মাসের প্রথম তারিখ অবধি চলিবেক।

৪ দফা। যে টাকা এই ব্যাঙ্কে ন্যস্ত হয় সে টাকা কোম্পানীর কাগজে রাখা যাইবেক কিম্বা বাঙ্গাল ব্যাঙ্কেতে কিম্বা অন্য ২ কুঠিতে রাখা যাইবে। যে ব্যক্তিরা ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ আছেন তাহারা ব্যাঙ্কে ন্যস্ত প্রত্যেক টাকার দায়িক। কিন্তু এই ব্যাঙ্কের এই অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থা যে এই ব্যাঙ্কের এক টাকাও বাণিজ্যাদিতে নিয়োগ করা যাইবেক না।

৫ দফা। ইংগ্লণ্ড দেশে এই মত ব্যাঙ্কে যে বিষয় চেষ্টা এই ব্যাঙ্কেরো সেই বিষয় চেষ্টা যে হিসাব এই মত সহজ হয় যে অত্যল্পকালের ব্যাঙ্কের হিসাব আদি করা যায় এই নিমিত্ত এই ব্যাঙ্কে পূর্ণ মাস ব্যতিরেকে ভাঙ্গা মাসে সুদ দেওয়া যাইবে না এবং বৎসরান্তে হিসাবের সময়ে আনা ও পাইএর সুদ দেওয়া যাইবে না। এবং সুদ কষিলে পাই ধরা যাইবে না।

৬ দফা। বৎসরান্তে ৩০ এফরেলে ব্যাঙ্কের হিসাব করা যাইবে। এবং সেকালে যে ব্যক্তির নামে যত সুদ হইবেক সেই সুদ আসলের সহিত সংলগ্ন হইয়া এই দুএর উপরে আগামী বৎসরের কারণ সুদ চলিবেক।

৭ দফা। কোন ব্যক্তি সেই ৩০ এফরেল তারিখ অবধি ৩১ মে পর্যন্ত এই একমাসের মধ্যে আপন টাকার কতক কিম্বা সুদ সমেত সমুদয় বাহির করিয়া লইতে পারিবেক এই মাস ব্যতিরেকে অন্য সময়ে পারিবেক না এবং যখন কেহ টাকা লইতে চাহে তাহার তিন মাস অগ্রে ব্যাঙ্কে সমাচার দিবেক কিন্তু যদি সমাচার দিয়া দুই মাসের মধ্যে তাহার মন ফিরে তবে ব্যাঙ্কে পুনর্ব্বার সমাচার দিলে তাহার টাকা সেইরূপ ব্যাঙ্কে টাকা থাকিবেক।

৮ দফা। ব্যাঙ্ক হইতে কোন লোকেরদের কাছে তাহারদের নিজ বিষয়ে ব্যাঙ্কের কোন সমাচার পাঠাইতে হইলে তাহার ডাকের খরচ এই ব্যক্তির নামে পড়িবেক।

৯ দফা। সরকার ও মুহুরী প্রভৃতি ও হিসাবের কেতাব ও কাগজ ও অন্য ২ যে খরচ ব্যাঙ্কের বিষয়ে হইবে তাহার কারণ শতকরা আদ টাকার হিসেবে প্রত্যেক জনের টাকা হইতে বৎসরান্তে বাদ যাইবেক।

১০ দফা। ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরদের হুকুম বিনা কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে ব্যাঙ্কে আপন ন্যস্ত টাকার বরাৎ দিতে পারিবেক না।

১১ দফা। ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মরিলে কিম্বা ব্যাঙ্ক হইতে ভিন্ন হইলে কিম্বা আর কোন নতুন অধ্যক্ষ ব্যাঙ্কে প্রবেশ করিলে ব্যাঙ্কের অন্তর্গত লোকেদের সমাচার দেওয়া যাইবেক।

ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা এই ২।

শ্রীযুত উইল্যম কেরী সাহেব।

শ্রীযুত জশুআ মার্শমন সাহেব।
শ্রীযুত উইল্যম ওয়ার্দ সাহেব।
শ্রীযুত জন মার্শমন সাহেব।

যে ব্যক্তি এই ব্যাঙ্কে টাকা রাখিতে বাসনা করেন তিনি 'মোং কলিকাতা আলেক্সান্দর কোম্পানীর নিকটে টাকা দাখিল করিয়া এই ব্যাঙ্কের রসীত লইবেক।"

এই ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেবার জন্য মিশনারীরা সকলের কাছে প্রচার করলেও প্রধানতঃ মিশন বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রদের এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের বিশেষ আহ্বান জানান। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের আহ্বান জানানোর প্রসঙ্গে এঁরা বলেন ধনীদের সঞ্চয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজন নেই। দেশীয়রা হয়তো প্রথমে এই নতুন ব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখতে পারবে না, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা হয়তো পারবে। এদের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যাও খুব কম নয়। মিশনারীরা আশা করেন সঞ্চয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে অন্ততঃ দরিদ্র এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের দুঃখ দূর করতে পারবেন। ই. ডি. পটস্ কেরীর একটি চিঠির উল্লেখ করে বলেছেন, "এই সঞ্চয় ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ দরিদ্র এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়প্রিয়তা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য স্থাপন করা হয়।"[১৬] পট্সের এই উক্তিটি পুরোপুরি সত্য নয়। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এঁরা ব্যাঙ্কটিকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু মিশনের আশ্রিত গরীব দেশীয়দের জন্যই প্রধানতঃ এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জন মার্শম্যানের উক্তি ছাড়া জশুয়া মার্শম্যানের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি চিঠিতে দেখা যায় তিনি ছাত্রদের এই ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়েছেন এবং তাদের এই ব্যাঙ্কের সুবিধা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।[১৭] ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে মার্শম্যান লিখেছেন, "অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুর্বিপাকের হাত থেকে এই ব্যাঙ্ক রক্ষা করতে পারবে। হঠাৎ চাকুরী চলে গেলে, ছোট ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে হলে, হঠাৎ মৃত্যু হলে (স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের) এবং বৃদ্ধ হলে এই ব্যাঙ্ক সাহায্য করবে।"[১৮]

ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের কি কি সুবিধা দিতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন "মিতব্যয়িতা ও ভবিষ্যতের পাথেয় সঞ্চয় উৎসাহ দেবার জন্য ব্যাঙ্ক ন্যূনতম অর্থ (এক টাকা) গ্রহণ করতে পারে, অর্থ জমা দেওয়া বন্ধ করলে বা মৃত্যু হলে সঞ্চিত অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে না, উচ্চতম হারে সুদ প্রদান করতে পারে, এবং আমানতকারীকে যখন ইচ্ছা টাকা তুলে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।"[১৯]

ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য থেকেই বোঝা যায় এঁরা এই পরিকল্পনা নিজেরা প্রসার করতে আগ্রহী ছিলেন না, বরং চেয়েছিলেন অপরে এইরূপ ব্যাঙ্ক

পরিচালনা করার কথা বিবেচনা করুক এবং বাংলা দেশে এই প্রয়াস সুপ্রসারিত হোক এটা ছিল তাদের একান্ত ইচ্ছা। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'তে এঁরা লেখেন, "দরিদ্র দেশীয়দের জন্য সঞ্চয় ব্যাঙ্ক অন্তত বাংলাদেশে খোলার কথা বিবেচনা করা অবশ্য কর্তব্য।"[২০]

এঁদের মতে এদেশের গরীব সাধারণের পক্ষে এরূপ প্রকল্প বিশেষ উপযোগী এবং সঞ্চয় ব্যাঙ্ক বৃটেনের তুলনায় এদেশে বেশী সুবিধা দিতে পারে কারণ, (১) এ দেশে সুদের হার বেশী, বৃটেনে যেখানে সুদের হার ৪% এখানে সে জায়গায় ৮ বা ৯%, (২) এখানে জীবনযাত্রার মান খুব সরল। এখানকার গরীবেরা অল্পে তুষ্ট, তাই তাদের খরচ খুব কম। ওদেশের তুলনায় এদেশের লোকেরা বেশী লাভবান হবে। এঁদের মতে, "এদেশীয়দের মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী হতে উৎসাহ দিলে শুধু এদের যে অভাব অনটন দূর হবে তা নয়, এদের অনেকেই বেশ সচ্ছল হয়ে উঠতে পারে।"[২১]

কেরী আশা করেছিলেন এদেশের চিন্তাশীল মনীষীরা স্বল্প সঞ্চয়ের উপযোগিতা বোঝাবার জন্য এগিয়ে আসবেন। কিন্তু দেশীয় সমাজের অনাগ্রহ ও ঔদাসীন্য তাঁকে বিস্মিত ও ব্যথিত করে। তবে কেরীর আশা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৩ সালে শ্রীরামপুর সঞ্চয় ব্যাঙ্কের অনুরূপ একটি সঞ্চয় ব্যাঙ্ক কলকাতায় স্থাপন করেন।[২২] ১৮২৯-৩০ সালে কয়েকটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবনতি ঘটায় কিছুটা অর্থসংকটের সৃষ্টি হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্প আয়ের মানুষকে আর্থিক নিরাপত্তা দেবার জন্য বেণ্টিঙ্ক এই ব্যাঙ্ক খোলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে এর কাজের উন্নতিও হয়। ১৮৪০ সালের মধ্যে চল্লিশ লক্ষের ওপর টাকা এই ব্যাঙ্কে জমা পড়ে এবং আমানতকারীর সংখ্যা সাড়ে চার হাজারকেও ছাড়িয়ে যায়।[২৩] তবে কলকাতার লোকেরাই শুধু এই ব্যাঙ্কের সুবিধা ভোগ করতে পেরেছিল। বাইরের লোক হিসাবে শুধু সৈন্যবিভাগের লোকেরা এর সুবিধা পেয়েছিলেন। এই ব্যাঙ্কের সাফল্যও এদেশীয়দের বিশেষ উৎসাহিত করতে পারেনি। মহাজনী ঘাতকদের হাত থেকে গরীব দেশবাসীকে বাঁচাবার জন্য সঞ্চয় ব্যাঙ্কের মত কোন প্রচেষ্টা সে-যুগে হয়েছিল বলে মনে হয় না। যদিও কলকাতার টি. বি. স্কট কোম্পানীর মত কেউ কেউ সারা ভারতে গরীবদের মধ্যে সঞ্চয় ব্যাঙ্কের সুবিধা ছড়িয়ে দেবার জন্য আবেদনপত্র প্রচার করেছিল। ১৮৪০ সালে স্কট কোম্পানী যে পুস্তিকা প্রকাশ করে তাতে সঞ্চয় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছে "ইহা দরিদ্রদের আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করবে এবং দুর্ঘটনা, মন্বন্তর, মহামারী প্রভৃতি দৈবদুর্বিপাকের সময় প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য করতে পারে।"[২৪]

সে-যুগের লোক এই প্রকল্পের প্রতি যতটা ঔদাসীন্য দেখিয়েছে ততোটা

না দেখালে হয়তো দেশের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামোর অনেক উন্নতি হতে পারতো। অবহেলিত গ্রামও উনিশ শতকের জাগরণের আলোয় উদ্ভাসিত হতো। পুস্তিকাটির রচয়িতা চিন্তা করেছিলেন কৃষক ও শ্রমিকদের আর্থিক দুর্ভাবনা দূর করতে পারলে তাদের পরিশ্রমের গুণ ও পরিমাণ বৃদ্ধি হবে। পুস্তিকায় বলেছে, "দরিদ্রদের অর্থ সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে তাদের পরিশ্রমের মান ও গুণ বাড়ানো যায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাদের উদ্যমও বেড়ে যাবে অনেক বেশী।"[২৫]

গ্রামের অর্থনৈতিক জীবনকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানুষের অত্যাচারের হাত থেকে সঞ্চয় ব্যাঙ্ক রক্ষা করতে পারে এই বিশ্বাসে পুস্তিকাটি লেখে, "সঞ্চয় ব্যাঙ্কের প্রসার দেশবাসীকে দুর্ভিক্ষ ও দুর্দশার পীড়ন হতে বাঁচাতে পারে।"[২৬]

প্রাচুর্যের মাঝে দারিদ্র্যই এদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা, কেরীর এই চিন্তা পরোক্ষভাবে এই পুস্তিকায় প্রতিফলিত হয়েছে। কেরী মনে করতেন দান-খয়রাতি করে গরীব লোকের ভালো করা যায় না। তাদের ভালো করতে হলে তাদের শেখাতে হবে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে, আর বিপদআপদ থেকে বাঁচবার সঙ্গতি জোগাড় করে রাখতে। অজ্ঞতা দূর করার সঙ্গে তিনি তাই দারিদ্র্য দূর করার কথাও চিন্তা করেছিলেন।

আন্তরিক প্রচেষ্টা, উদ্যম ও নিষ্ঠার অভাব মিশনারীদের মধ্যে ছিল না এবং সঞ্চয় ব্যাঙ্কের সূচনাও হয়েছিল উৎসাহব্যঞ্জক, তা সত্ত্বেও এঁরা ব্যাঙ্কটি স্থায়ী করতে পারেননি। পাঁচ বছর সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হবার পর ১৮২৪ সালে আমানতকারী সকলের গচ্ছিত অর্থ ফেরত দিয়ে ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।[২৭] সাফল্যের মুখে এসে ব্যাঙ্কটি বন্ধ হয়ে যাওয়া খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। আরও কিছুদিন পরিচালিত হলে দেশীয় সমাজের ওপর বোধহয় কিছু প্রভাব বিস্তার করতে পারতো। অক্ষমতা নয় প্রতিকূল পরিবেশের জন্যই মিশনারীরা ব্যাঙ্কটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন এবং তার বিশেষ কারণ বোধহয় নিম্নলিখিতগুলি—

(১) ১৮২১ সালে ফেলিক্স কেরী (ডাঃ উইলিয়ম কেরীর বড় ছেলে) এবং ১৮২৩ সালে মিশনের অন্যতম সংগঠক উইলিয়াম ওয়ার্ডের মৃত্যুতে মিশন পরিচালিত কার্যাবলীর প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। (২) কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড ও জন ছাড়া মিশনের আর কেউই এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। (৩) গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব ও কাজের চাপ অনেক বেড়ে যায়। (৪) শ্রীরামপুর ডেনমার্কের অধীনে, আর্থিক লেনদেন হয় বেশীর ভাগ শ্রীরামপুরের বাইরে, তাই নানা অসুবিধা দেখা দেয়। (৫) বৃটেনে এরূপ প্রতিষ্ঠানে আর্থিক দায়িত্ব বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একত্রে গ্রহণ করেন; এখানে

সেই দায়িত্ব শুধু তিনচারজন মিশনারীর ওপর ছিল। উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়াও মিশনের কাজের চাপ তখন সবদিক দিয়েই বেড়ে গিয়েছিল এবং ওয়ার্ডকে হারিয়ে কেরী ও মার্শম্যান খুবই মুষড়ে পড়েছিলেন। তাই একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এঁরা ব্যাঙ্কটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

দেশীয় সমাজে ব্যাপকভাবে এই ব্যাঙ্কের কর্মক্ষেত্র ছড়িয়ে না পড়লেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকার এর ধারাটি বজায় রেখে যায়। ১৮৩১ হতে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত বেণ্টিঙ্ক প্রতিষ্ঠিত সঞ্চয় ব্যাঙ্ক বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হয়। ১৮৬১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্ক অফ্ বেঙ্গল-এর দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৮৯৬ সালের ১লা অক্টোবর এর দায়িত্ব সরকারি ডাকঘরের হাতে তুলে দেওয়া হয়।[২৮] মানব-কল্যাণে ব্রতী কেরীর এই মহৎ প্রয়াস দেশীয় সমাজে সঞ্চারিত হয়নি বটে কিন্তু এদেশের সাধারণ মানুষের জন্য নিবেদিত এই মহামনীষীর মানব-কল্যাণ ব্রতের জ্বলন্ত নিদর্শনরূপে এই সঞ্চয় ব্যাঙ্ক অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উল্লেখপঞ্জী

১. চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার : বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজন—ভূমিকা। পৃ ১ (১৯৭৪)

২. Kenneth Ingham : Reformers in India. p. 1 (1955)

৩. Sen, Keshab Chandra : Jesus Christ, Europe and Asia. p. 17 (1866)

৪. Farquhar : Modern Religious Movements in India. p. 387

দাস, পি. কে. : শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ও রাজা রামমোহন রায়। আলেখ্য, ১:৬ (১৯৭২)

৫. Marshman, J. C. : Life and Times of Carey, Marshman and Ward. Vol. II, p. 486 (1859)

৬. K. Ingham : Reformers in India. p. 116 (1955)

৭. Carey William : State of Agriculture in Dinajpore. Asiatic Researches, Vol. X, p. 3, 21 (1811)

৮. Symes-Scutt : History of Bank of Bengal. p. 1, (1904)

৯. Cooke, C. N. : Rise and Progress of Banking in India. P. 13 (1863)

১০. Symes-Scutt : History of Bank of Bengal. p. 1—3 (1904)

১১. Marshman, Joshua : Friend of India (Monthly), No. X, Feb. 1819, p 72

১২. Edinburgh Review : Review of the short account of Edinburgh Savings Bank, June 1815, Vol. XXV, p 146

১৩. BMS (MSS) : Chamberlain to Ryland, Aug. 19, 1819 ; Quoted in British Baptist Missionaries in India—E. D. Potts (1967)

১৪. Marshman, J. C. : Life and Times of Carey, Marshman and Ward. II, p. 223 (1859)

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ : সংবাদপত্রে সেকালের কথা । ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৬ (১৩৭৭)

১৬. Potts, E. D. : British Baptist Missionaries in India. p. 70 (1967)

১৭-১৯. Marshman, Joshua : Bank for Savings, March 4, 1819, p. 2, 3

২০-২১. Friend of India (Monthly), No. X, Feb. 1819, p. 73

২২. Cooke, C. N. : Rise and Progress of Banking in India. p. 77 (1863)

২৩-২৬. T. B. Scott & Co. : Remarks on the Savings Bank. p. 7, 3, 4 (1840)

২৭. Marshman, J. C. : Life and Times of Carey, Marshman and Ward. II, p. 223 (1859)

২৮. Symes-Scutt : History of Bank of Bengal. p. 67 and 104 (1904)

রামরাম বসুর ধর্মচিন্তা

বিশিষ্ট গবেষক ডেভিড্ কফ্ লিখেছেন, "Ramram Basu, a little known Bengali Pundit, was the predecessor of Rammohan Roy in the discovery or invention of a monotheistic in Hinduism"[১] কোন্ তথ্যের ভিত্তিতে কফ্ 'discovery or invention' বলেছেন তা বোঝা যায় না, হিন্দুধর্মের ইতিহাসে ব্রহ্মবাদী চিন্তা ও তার চর্চায় কখনও ছেদ পড়েনি। তাই আবিষ্কার কথাটা এখানে অপ্রযোজ্য। বরং বলা যেতে পারে আধুনিক চিন্তাধারার ঊষালগ্নে রামরাম যুক্তিবাদী চিন্তাধারাকে জনপ্রিয় করতে নতুনভাবে উদ্যোগী হন। অসম্পূর্ণ সে প্রয়াসের সার্থক রূপায়ণ হয় রামমোহনের চেষ্টায়।

ডঃ রিচার্ড ফক্স ইয়ং* মনে করেন যে, কফের এই উক্তি তথ্যভিত্তিক নয়। রামরামের লেখা প্রচার পুস্তিকা না দেখেই কফ্ এরূপ মন্তব্য করেছেন বলে ইয়ং-এর ধারণা এবং তিনি মনে করেন যে, তিনিই প্রথম পুস্তিকাগুলি দেখেছেন।[২] কফ্ বলেছেন, রামমোহন ব্রহ্ম বা একেশ্বরবাদ সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচার করেন তা ১৮০০-১৮০২ সালে রামরাম কর্তৃক লিখিত পুস্তিকায় দেখা যায়।[৩] রামরাম ঐ সময় শ্রীরামপুর মিশনের জন্য দুটি প্রচারপুস্তিকা রচনা করেন। প্রথমটি ধর্মপুস্তকের দূত এবং দ্বিতীয়টি জ্ঞানোদয়। কিন্তু ঐ পুস্তিকা দুটিতে রামরামের ধর্মচিন্তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কফের অনুমান রামরাম পরমব্রহ্মের ধারণার মধ্য দিয়েই জেহোভাকে দেখেন।[৪] কফ্ রামমোহনকে রামরামের প্রকৃত উত্তরসূরী বলে মনে করেন এবং যে, বলেন এঁরা দুজনেই ধর্ম ত্যাগ না করে ধর্মকে পরিশোধন করতে চেয়েছিলেন। পূর্ববর্তী গবেষকদের অভিমতকে নিজের মন্তব্যের সপক্ষে উল্লেখ করেছেন ডেভিড কফ।[৫]

রামরাম-রামমোহন সাক্ষাৎকারের অবাস্তব কল্পনাও অনেকে করেছেন এবং কেউ কেউ মনে করেন রামমোহনের প্রভাবেই রামরাম খৃষ্টধর্ম গ্রহণে বিরত থাকেন। এরূপ অনুমান তথ্যভিত্তিক নয় এবং উদ্দেশ্যমূলক বলা যেতে পারে।

রামরামের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচিন্তার পরিচয় আমরা পাই—(১) খৃষ্ট ধর্মসংগীত ও প্রচার-পুস্তিকা, (২) লিপিমালার বক্তব্য, (৩) টমাস ও কেরীর বিবরণ এবং (৪) বি. এম. এস.-এর সম্পাদক রাইল্যান্ডকে লেখা চিঠি বিশ্লেষণ করে। রামরাম বসু হুগলী জেলার চুঁচুড়ায় একটি দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ অভিজাত শ্রেণীর ছিলেন, কারণ নিজের বংশ পরিচয়ে বলেছেন, "আমি তাহাদের [রাজা প্রতাপাদিত্যের]

---

* প্রাচ্যতত্ত্বের বিশিষ্ট আমেরিকান গবেষক।

স্বশ্রেণী।"[৬] চব্বিশ পরগণার নিমতা গ্রামে তিনি বাল্যশিক্ষা পান এবং ফার্সী ভাষা শেখেন। তারপর কলকাতায় আসেন জীবিকার সন্ধানে। কলকাতায় এসে কিছু ইংরেজি শিখে নেন এবং নবাগত সাহেবদের কাছে দোভাষীর কাজ করেন। সাহেবদের কৃপায় ভাগ্য ফিরিয়ে নেবার সুযোগ তিনি কাজে লাগাননি। টাকা রোজগারের ধান্দা তাঁর ছিল না। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি চেম্বার্সের ফার্সী ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন। চেম্বার্স তাঁর নির্লোভ গুণের জন্য খুব প্রীত হন এবং কোম্পানীর জাহাজের ডাক্তার টমাসের মুন্সীর কাজে তাঁকে নিয়োগ করতে সুপারিশ করেন। খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে টমাস বাংলা শিখতে চান, একথা জেনেই রামরাম তাঁর কাজে যোগ দেন। এই ঘটনা থেকে তাঁর ধর্মীয় মানসিকতার আভাস পাওয়া যায়। মাসিক কুড়ি টাকা বেতনের দোভাষীর কাজ তাঁর কাছে অপ্রাপ্য ছিল না, কিন্তু নিজের ইচ্ছাতেই তিনি ধর্ম-প্রচারক টমাসের কাজে যোগ দেন। ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহই তাঁকে এই কাজে ব্রতী করে। বাংলা শেখানো ছাড়া ধর্মপ্রচারে তিনি টমাসের দোভাষীরও কাজ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানও অর্জন করেন। টমাসের সঙ্গে সবসময় থেকে এবং সব কাজে সাহায্য করে তিনি পেতেন মাসিক কুড়ি টাকা মাত্র। আর্থিক লাভের আশায় তিনি টমাসের কাছে পড়ে থাকেননি। ধরে নেওয়া যেতে পারে রামরাম টমাসের কাজে অনুৎসাহী ছিলেন না। মনে হয় আঠারো শতকের শেষার্ধ হতে সমাজে ধর্মীয় অপশাসনের যে তাণ্ডব চলছিল, তাতে তিনি খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। জাতি বৈষম্য, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার, অমানবিক আচার-বিচার তাঁর মনকে বিদ্রোহী করে তোলে। বিধর্মীদের সহায়তায় এই অপশাসনের ওপর আঘাত হানতে চেয়েছিলেন তিনি। দেশীয় সমাজের হাতে নিজের নিগৃহীত হবার কথা তিনি বিস্মৃত হননি। বিপদের সে ঝুঁকি নিয়েই তিনি টমাসকে সাহায্য করেন।

টমাসের কাছ থেকে পাপী-তাপী ও অসহায়দের জন্য যীশুখৃষ্টের কষ্ট স্বীকার ও আত্মদানের কাহিনী শুনে তিনি খৃষ্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। তাঁর এই মনোভাব ফুটে উঠেছে বাংলা ভাষায় প্রথম খৃষ্টের স্তব রচনার মধ্য দিয়ে। এর পেছনে ছিল তাঁর নিজস্ব প্রেরণা। টমাস তাঁকে এরূপ স্তব রচনার জন্য কোন অনুরোধ করেননি। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি স্তবটি রচনা করে টমাসকে উপহার দেন। এর প্রথম চার লাইন ঃ

"কে আর তারিতে পারে
লর্ড জিজছ ক্রাইষ্ট বিনা গো।
পাতক সাগর ঘোর
লর্ড জিজছ ক্রাইষ্ট বিনা গো।"[৭]

অসহায়ের ত্রাণকর্তারূপে যীশুখৃষ্ট রামরামের অন্তর জয় করেন। ১৭৯২

খৃষ্টাব্দে টমাস ইংলণ্ডে ফিরে যান এবং রামরামের স্তবটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদটি লিড্‌সে **Hindoo's Hymn** নামে প্রচারিত হয় এবং ওখানকার ব্যাপটিষ্ট মণ্ডলীতে গীত হয়।[৮]

টমাসের ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনের পর রামরাম স্বগ্রামে ফিরে আসেন। তাঁর নাম ইংলণ্ডে ছড়িয়ে পড়লেও দেশীয় সমাজ তাঁর উপর খুব বিরক্ত হয়। পাদ্রীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা সমাজ-প্রশাসকেরা খুব সন্দেহের চোখে দেখে, অনেক সামাজিক নিগ্রহ তাকে সহ্য করতে হয়েছে এই সময়। সুবিধামত চাকরীও জোগাড় করতে পারেননি। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে টমাস যখন কেরীকে নিয়ে ফিরে আসেন তখন দেখেন রামরাম তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছেন। কেরীর বিবরণ থেকে জানা যায়, "To our great grief, he (Ram Ram) has been bowing down to idols again. When Mr. T left India, he went to place to place, but forshaken by the Hindoos and neglected by Europeans, he was with flux and fever. In this state, he says, 'I had nothing to support me or my family, a relative offered to save me from perishing from want of necessities, on condition of my bowing down to the idol....I hesitated and complied ; but I love christianity still."[৯]

কেরীর এই বিবরণ থেকে জানা যায় শুধু দেশীয় সমাজ নয়, ইউরোপীয় সমাজও রামরামকে প্রত্যাখ্যান করে। ধর্ম নিয়ে কোন সাহেব তখন মাথা ঘামায় না, রামরামের খৃষ্টধর্ম প্রীতি সাহেবরাও তাই ভালো চোখে দেখেনি। টমাসের অনুপস্থিতিতে রামরাম মনোভাবের পরিবর্তন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর পাঁচজন দোভাষীর মত ভাগ্য ফিরিয়ে নেবার কাজে মন দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। নির্যাতন সত্ত্বেও তাঁর মানসিক দৃঢ়তা ভেঙে পড়েনি। কেরীর মুনসী হিসাবে তিনি ১৭৯৩ থেকে কাজ শুরু করেন এবং ১৭৯৬ পর্যন্ত দুঃখ ও বিপর্যয়ের সহযোগী হয়ে তাঁর সঙ্গে থাকেন। এই সময় কেরীর দিনলিপি থেকে রামরামের অনেক খবর পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর খৃষ্টধর্ম প্রীতি বৃদ্ধির কোন খবর পাওয়া যায় না। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। রামরাম তখন বাড়ী চলে আসেন। কিন্তু কিভাবে তিনি জীবন কাটান তা জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায় যে, সামাজিক নির্যাতন থেকে তিনি রেহাই পাননি। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কেরী শ্রীরামপুরে এলে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং মিশনারীদের কাজে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। তবে তিনি শ্রীরামপুরের কাজে পুরোপুরি যোগ দেননি। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারীর এক চিঠিতে রামরাম লেখেন, "মাষ চারি হৈল শ্রীযুত ফুরসাইত সাহেব শ্রীযুত ডকলিষ সাহেবের নিকট

কোম্পানী সরকারের হেস্পের কাজে সুসঙ্গ করিয়াছেন সেই কাজে এখন পর্য্যন্ত আছি শ্রীরামপুরের নিকট একস্থান তাহার নাম রিষড়া সেই স্থানে থাকি।"[১০] ওয়ার্ডের দিনলিপি থেকে রামরামের শ্রীরামপুর মিশনের কাজে যোগদান সম্পর্কে জানা যায়। ওয়ার্ড লিখেছেন, "১৮০০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে কেরী তাঁর মুন্সীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। মুন্সী শ্রীরামপুরে কেরীর আসার সংবাদ পেয়ে দেখা করতে আসেন। তাঁকে দেখে মনে হয় বিজ্ঞলোক। ইংরেজি ভালই বলতে পারেন।...রামরামকে সামান্য পারিশ্রমিকে মিশনের কাজে নিযুক্ত করা হয়।"[১১]

১৮০১ খৃষ্টাব্দে রামরাম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সহকারী পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। তিনি তখন রিষড়ার কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। ইতিমধ্যে রামরাম মিশনের জন্য দুটি পুস্তিকা লিখেছেন। প্রথমটির নাম 'ধর্মপুস্তকের দূত বা গসপেল মেসেঞ্জার বা হরকরা'। **১৮০০** খৃষ্টাব্দ থেকেই মিশন প্রেসে বাংলা বাইবেল ছাপা শুরু হয়। এই বইটি প্রকাশের আগেই যাতে লোকে বাইবেল সম্বন্ধে আগ্রহী হয় সেই উদ্দেশ্যে কেরী রামরামকে একটি প্রচারপুস্তিকা লিখে দিতে বলেন। টমাসের জীবনীতে আছে, **"Ram Boshoo's Harkara, a poetical tract, intended as an instruction to Gospel which the singular man had written and presented to the missionaries."**[১২]

পুস্তিকাটিতে বাইবেল পাঠের উপযোগিতার কথা বলা হয়েছে। এটা অনুবাদ নয়, রামরামের নিজস্ব রচনা। এখানে মিশনারীদের বক্তব্য রাখা হয়েছে, রামরামের অভিমত নয়। মিশনারীরা খুশী হন। ওয়ার্ড দিনলিপিতে লিখেছেন, **"the piece which he (Ram Bashoo) has written in recommendation of the Bible is likely to be useful."**[১৩] মূল পুস্তিকাটি এতদিন কেউ দেখেননি, মিশনারীদের উল্লেখ থেকেই এ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেছে। সম্প্রতি ডঃ ইয়ং তাঁর গবেষণার প্রয়োজনে পুস্তিকাটির কপি ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটি থেকে সংগ্রহ করেছেন। পুস্তিকাটির বক্তব্য এবং কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল ঃ[১৪]

"শুনরে জগৎ লোক শুন একমনে
নরক দুস্তরে ত্রাণ পাইবা কেমনে।
তাহার উদ্দেশ নাহি কর কোন জন
নিরবধি চিন্ত টাকাকড়ির কারণ।" পংক্তি ১—৪

পার্থিব দ্রব্যাদি স্বল্পকালের, মৃত্যুতে সব ছেড়ে যেতে হবে এবং হয় স্বর্গ কিংবা নরকে যেতে হবে। পাপ থেকে মুক্তি না পেলে অনন্তকাল নরকের আগুনে পুড়তে হবে। সেজন্য ঃ

"আশ্রয় করহ খৃষ্ট আশ্রয় করহ।
আশ্রয় বিহনে ত্রাণ নাহি পাবে কেহ।
অন্য শাস্ত্রে উদ্ধারের নাহি বিবরণ।
কতগুলা দেশাচার ক্রিয়ার বচন।" পংক্তি ২৩—২৬

হিন্দু-মুসলমানের অনেক শাস্ত্র আছে, কিন্তু ত্রাণের উপায় নেই। ধর্ম-পুস্তকেই কেবল ত্রাণের উপায় বলা আছে। এই পুস্তকের কথা এখানে বলা হচ্ছে ঃ

"শুনরে ২ লোক শুন সাবধানে
যার ইচ্ছ তিনি আইস করাব শ্রবণে।
ম্লেচ্ছ বলি ঘৃণা পাছে করহ সভায়
ম্লেচ্ছ শাস্ত্র নহে এই ত্রাণের উপায়।" পংক্তি ৩৮—৪২

এই জগৎ সংসার সৃষ্টি করে ভগবান ঘোষণা করলেন যে, যারা ধর্মপথে থাকবে তারা স্বর্গসুখ ভোগ করবে এবং যাদের মধ্যে সামান্য পাপও থাকবে তারা অনন্তকাল নরকভোগ করবে। ঈশ্বরের এই আদেশের ফলে প্রায় সব লোককেই নরকে যেতে হয়। তখন ভগবানের দ্বিতীয় আজ্ঞা হল পাপীরা মুক্তি পেতে পারে যদি কেউ তাদের জন্য পৃথিবীতে যায় ঃ

"কে জন্মিবে কে সহিবে কে লইবে ভার।
হইল অনাথ নাম যিশু অবতার।" পংক্তি ৬৩—৬৪

সকলের পাপের যন্ত্রণা নিজের দেহে ধারণ করার জন্য যীশু ধরায় অবতীর্ণ হয়ে বললেন, যে তাঁর কাছে আশ্রয় নেবে তাকেই তিনি উদ্ধার করবেন। পৃথিবীতে এসে তিনি অনেক অলৌকিক কাজ করলেন, যন্ত্রণাভোগ করলেন এবং অনেককে উদ্ধার করে নিজের জীবন দান করলেন। মঙ্গল আখ্যান গ্রন্থে এই সম্পর্কে লেখা আছে। হিব্র ও গ্রীক ভাষায় ইহা লিখিত ছিল, পরে ইংরেজীতে তর্জমা হয়।

"কেবল তাহারা নহে অন্য বহু প্রাণী
তরজমা করিল মহাশাস্ত্র চুড়ামণি।
রশিন ফরাসী আর ওলন্দাজগণ
জারমানি দিনমার্ক আরমান বহুজন।
আমেরিকা আফ্রিকা আশিয়ার যম স্থান
আর যত উপদ্বীপ প্রধান প্রধান।" পংক্তি ৯৫—১০০

যারা এই ধর্মপুস্তক পেল তারা পূর্বের ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করল। এখন বাংলা ভাষায় তর্জমা হয়েছে ঃ

"এখন যদি তোমাদের শুনিবার মন।
আইস যত্ন করি মোরা করাব শ্রবণ।" পংক্তি ১০৭—১০৮

এখানে রামরামের নিজস্ব ধর্মচিন্তার পরিচয় না পাওয়া গেলেও যীশুখৃষ্ট এবং খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। যেহেতু যীশু পাপী-তাপীদের ত্রাণের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন, সেজন্য তিনি এই ধর্মকে ম্লেচ্ছ বলতে রাজী নন। রামরামের ব্রহ্মচিন্তার পরিচয় পুস্তিকাটিতে কিছুই নেই।

তাঁর দ্বিতীয় পুস্তিকা 'জ্ঞানোদয়' সম্বন্ধে ওয়ার্ড লেখেন, "The dawn of wisdom by the same pundit, written to invite his countrymen to investigate christianity."[১৫]

পুস্তিকাটি ব্রাহ্মণদের আক্রমণ করে লেখা। ওয়ার্ডের দিনলিপিতে আছে, "Lord's Day, August 31, 1800. After dinner brother Carey read and translated to us a cutting piece of verse against the Brahmins written by Ram Boshoo. 'You may think, you are God's', says he, 'and have no sin, but when you leave the body you will be as light as the sun and all your sin will be magnified in an inconcievable manner.' We have the honour of printing the first that was ever printed in Bengali and this is the first piece in which the Brahmines have been opposed for thousand years."[১৬] দেশীয় সমাজ এই পুস্তিকাটির জন্য শ্রীরামপুর মিশনারীদের ওপর খুব চটে যায়, রাগটা বেশী হয় ব্রাহ্মণদের। কেরীও স্বীকার করেন যে পুস্তিকায় ব্রাহ্মণদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে। প্রতিক্রিয়া এত তীব্র হয় যে একজন পাঠক সরকারের সচিব এডমনস্টোনের কাছে অভিযোগ করেন, 'এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য হিন্দুধর্ম নষ্ট করা।' তিনি জানতে চান সরকার এর প্রচার অনুমোদন করেন কিনা। এডমনস্টোন জানান এর ইংরেজী অনুবাদ দেখে বিষয়টি বিচার করা হবে। ব্যাপারটি সেখানেই ধামাচাপা পড়ে যায়।[১৭] তবে দেশীয় সমাজের ওপর এর প্রতিক্রিয়া খুব হয়েছিল। মিশনারীরা এরপর থেকে সাধারণ শ্রোতাদের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষ লক্ষ্য করেন। ওয়ার্ডের দিনলিপিতে আছে, "The Brahamans behaved in the most insolent manner. They called him (Ram Basu) a beast because he wore European clothes...They were ready to beat him."[১৮] অন্যত্র আছে, "Ram Boshoo was sitting among some natives lately, who were talking about the book which he had written against the Brahmans, though they did not know that he was the author. The Brahmans said that it was written by some dung eator's son."[১৯] জ্ঞানোদয়ের মূল বাংলা রচনাটি কেউ দেখেননি। কেরী

কর্তৃক এর ইংরেজী অনুবাদটি ইংলণ্ডে বি. এম. এস.-এর সংগ্রহশালায় আছে। ইংরেজীটি বাংলার যথাযথ অনুবাদ কিনা বলা যায় না, কারণ কেরীর নিজস্ব বক্তব্য এর মধ্যে মিশে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

জ্ঞানোদয় বা Dawn of Wisdom-এ জ্ঞানের ভাগ খুব কম। এর এক-তৃতীয়াংশ হল নরক যন্ত্রণার বর্ণনা। যেমন, "The body will not consumed at once but will burn slow degrees as sawdust, when it has burnt for eternal length of time, even that not a single lair of the body will be consumed to ashes. The wisdom conveyed here is that God's wrath cannot be appeased by worshipping images, bathing in the Ganges, reciting the Gayatri, becoming Sanyasis or a gift of a few cowris. No Hindu in particular no Brahman has, by there means saved, all are burning in that unquenchable fire, crying, 'O, save! save! but without hope of relief."[২০] পুস্তিকায় বলা হয়েছে যে, হিন্দুধর্মে পাপী-তাপীদের পরিত্রাণের উপায় নেই। রামরামের ধর্মচিন্তা পর্যালোচনা করলে মনে হয় এটা রামরামের নিজস্ব বক্তব্য নয়। ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা ও অপশাসনের বিরুদ্ধেই তিনি বলতে চেয়েছিলেন। অনুবাদ করার সময় কেরী হয়ত তাঁর নিজস্ব চিন্তাও এর মধ্যে মিশিয়ে দেন। পুস্তিকায় বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কাউকে হিন্দুধর্মের সঠিক তত্ত্ব জানতে দেওয়া হয় না এবং তাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছামত শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা প্রচার করে। রামরাম পুস্তিকায় লিখেছেন, "You (Brahmans) are deceiving, malicious, artful, pernicious and profilgate and this destroys those who are under protection."[২১]

ব্রাহ্মণদের দ্বারা সবচেয়ে বেশী প্রতারিত গরীব অসহায় জনসাধারণ ও মেয়েরা। ধর্মের অনুশাসনে মেয়েরাই বেশী ভীত, তাই তারা সহজে প্রতারিত হয়ে, 'commit themselves to flames at the death of their husbands.'[২২] পুস্তিকায় বলা হয়েছে যে, মেয়েরা জীবন্ত পুড়ে মরে ব্রাহ্মণদের বিশ্বাসঘাতকতায়, শাস্ত্রের নির্দেশে নয়। হিন্দুধর্মের ওপর নয়, রামরামের অভিযোগ ধর্মের ব্যাখ্যার ওপরে। সতীদাহ প্রথা যে শাস্ত্রসম্মত নয় রামরাম ১৮০২ খৃষ্টাব্দেই নির্ভয়ে তা প্রচার করেন এবং তিনিই প্রথম এ বিষয়ে সোচ্চার হন। পুস্তিকায় আছে, "The man who reasons the truth of the Vedas will be born chandals, through this fear nobody investigates them, in consequence of which this pernicious shastras is not exposed."[২৩] মূল বাংলায় রামরাম বেদ বা ধর্মশাস্ত্র

সম্বন্ধে একথা বলেছেন বলে মনে হয় না, তিনি ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রচারিত অনুশাসনগুলি সম্পর্কে হয়ত এরূপ অভিমত দেন। কিন্তু পূর্বের পুস্তিকার মত এখানেও রামরামের ব্রহ্মচিন্তার কোন আভাসই পাওয়া যায় না। ডেভিড্ কফের ধারণার সমালোচনা করে ডঃ ইয়ং বলেন, "but there is no evidence at all to say that in this christian inspired puritanical reaction we find the germs of an idea generally attributed Rammohan Roy."[২৪]

'লিপিমালা' (১৮০২) প্রকাশের পূর্বে রামরামের ধর্মচিন্তার পরিচয় স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়নি। কাল্পনিক চিঠিপত্রের মাধ্যমেই তিনি নিজের ধর্মমতকে প্রকাশ করেন। তাঁর যুক্তিভিত্তিক উদার ধর্মচিন্তা এবং বেদভিত্তিক ব্রহ্মবাদে তাঁর গভীর বিশ্বাস লিপিমালার পত্রের মধ্যে পরিষ্কার দেখা যায়। এই মনোভাব তিনি বিদেশীদের সংস্পর্শে আসার পর পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। বৈদান্তিক চিন্তাধারা তখন বাংলাদেশে মোটেই অপ্রচলিত ছিল না। বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে এবং বেনারসে বেদশিক্ষার জনপ্রিয়তা কম ছিল না। কথকতা প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রামের অল্পশিক্ষিত মানুষের কাছে বৈদান্তিক অনুশাসন সুপ্রচারিত ছিল। বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গে ব্রহ্মবাদীরাও নিশ্চিন্তে ধর্মচর্চা করত। এই পরিবেশ থেকেই রামরামের বৈদান্তিক চিন্তার উদ্ভব হয়। তিনি কোন চতুষ্পাঠী বা টোলে পাঠগ্রহণ করেননি।

লিপিমালা লেখার সময় রামরামের ওপর শ্রীরামপুর মিশনের কোন নির্দেশ ছিল না এবং তাঁর নিজস্ব অভিমত প্রকাশের সুযোগ তিনি পান। লিপিমালা শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। ইংরেজ সিবিলিয়ান ছাত্রদের বাংলা চিঠি লেখার পদ্ধতি শেখানোর জন্য বইটি লেখা হয়। এখানে কাল্পনিক চিঠির মাধ্যমে রামরাম নিজের ধর্মীয় চিন্তাধারা প্রকাশের সুযোগ পান। তাছাড়া নানা পৌরাণিক কাহিনী সংযোজন করে বাংলা কথাসাহিত্যেরও সূচনা করেন।[২৫]

লিপিমালার ভূমিকাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই অল্প পরিসরের মধ্যেই রামরাম তাঁর ব্রহ্মবাদী মনের অনেকখানি পরিচয় দেন। তিনি লিখেছেন, "সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা জ্ঞানদ সিদ্ধিদাতা পরম ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে।"[২৬] রামরাম এখানে তাঁর উপাস্য দেবতার স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। তাঁর ধর্মমতের ভিত্তি ছিল বেদান্ত আশ্রয়ী এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁর চিন্তা যুক্তিনির্ভর ছিল। তিনি জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণ বৈষম্যের বিরোধী ছিলেন। প্রথাগত ধর্মশিক্ষা তাঁর ছিল না, তৎকালীন বাংলাদেশে যে বেদান্তচর্চার ধারা প্রচলিত ছিল তারই প্রভাবে তাঁর ধর্মীয় মন গড়ে ওঠে।

লিপিমালার মোট চল্লিশটি চিঠির অনেকগুলিতে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির কাহিনী সংযুক্ত হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজের কথাও আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের কাহিনী, সৃষ্টি বিবরণ প্রভৃতি পরিবেশন করার সময় কোনরূপ সংকীর্ণতার পরিচয় তিনি দেননি। নিজে ব্রহ্মবাদী এবং প্রতিমা বিরোধী, কিন্তু হিন্দুধর্মের সহনশীলতা গুণটি তাঁর পুরোপুরি ছিল। তাই কোন বিশ্বাসকেই তিনি আঘাত করতে চাননি। তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল তারা যারা ধর্মের নামে সমাজের ওপর নিষ্ঠুর পাশবিকতার সঙ্গে উৎপীড়ন চালাচ্ছিল। লিপিমালা বইটি সাহেবদের জন্য রচিত হয়েছিল, এখানে হিন্দুধর্ম ও সমাজের সমালোচনা করার অনেক সুযোগ ছিল, তিনি তা গ্রহণ করেননি, কারণ বিদেশীদের কাছে নিজেদের দোষত্রুটি সম্পর্কে প্রচার দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়—এই ছিল তাঁর মত। বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজের কথা বলার সময়, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতির কথা এবং শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি উপাসক সম্প্রদায়ের কথা বলার সময় তিনি কারও প্রতি কটাক্ষপাত করেননি। বৈদান্তিক অভিমত প্রকাশ করার সময় বলেছেন, "এই বেদ ও শাস্ত্র বেদোক্ত সমস্তই ধর্ম, তদ্ভিন্ন অধর্ম।"[২৭] জ্ঞানোদয়ের ইংরেজী অনুবাদে আছে বেদ পাঠ করলে চন্ডাল হবে আর এখানে বলছেন বেদই ধর্ম। তাই মনে হয় জ্ঞানোদয়ের ইংরেজী অনুবাদের বক্তব্য মিশনারীদের বক্তব্য, রামরামের নয়। জ্ঞানোদয়ের মূল বাংলা দেখতে না পাওয়ায় এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।

রামরামের অভিমত গঠনে ইসলাম ধর্ম কোন প্রভাব বিস্তার করেনি। ইসলাম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য খুবই অল্প। তিনি শুধু বলেছেন, "পশ্চিম সমুদ্র তীরে একজন মহামদ নামে উদ্ভব হইয়া তাহার নিজ কৃত শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া কয়েকজন বলবান নষ্ট লোক এক মন্ত্রণা করিয়া অনেক ২ লোকের জাতি ধ্বংস করিল···।"[২৮]

মুসলমানদের হাতে রামরামের পূর্বপুরুষেরা সবকিছু হারিয়েছিলেন, তাই তাদের ধর্মের প্রতি রামরামের কোন শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু যীশুখৃষ্ট ও খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, লিখেছেন, "খৃষ্টই সমস্ত। এ কি ইহার তদন্ত যদি ও অঞ্চলে প্রকাশ থাকে তবে লিখিবেন···"[২৯] রামরাম মনে করেন খৃষ্টধর্ম বিচার করে দেখার প্রয়োজন আছে। খৃষ্ট বিবরণ দেবার সময় তিনি লিখেছেন, "খৃষ্ট বিবরণ মহাশাস্ত্র এদেশে প্রকাশ হইতেছে এই কথা শ্রবণে আমার সভাস্থ যাবতীয় লোক মহানন্দে প্রমোদিত, এজনও ততোধিক"।[৩০] রামরামের উদার ধর্মবিশ্বাসের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ এটি।

সকল মানুষের প্রতি রামরামের অকৃত্রিম দরদ ও বিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে এই লিপিমালায়, তিনি লিখেছেন, "মানুষ এক বীজ হইতে উদ্ভব, ইহাতে

সকলে ভাই ভাই। যদি ভ্রাতৃগণের মধ্যে কাহারও দুঃখ কি সুখ হয় তাহাতে অন্যান্য ভ্রাতৃদিগের বিমর্ষ কি হর্ষ।"[৩১] রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের আগে উনিশ শতকে রামরামের মত সার্বজনীন সৌভ্রাতৃত্বের কথা আর কেউই বলেননি। সকল মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধের ওপরই ছিল তাঁর ধর্মবিশ্বাস।

লিপিমালার কয়েকটি চিঠির মুখবন্ধে কয়েকছত্রের কবিতা আছে।" এগুলি প্রধানত ঈশ্বরের স্তব, তাঁর ধর্মবিশ্বাস এগুলির মধ্যে সুপরিস্ফুট।[৩২] যেমন,

(১) "চরাচর সৃষ্টিকর্তা যেই মহাশয়
জয় জয় প্রাপ্ত হয় তার বন্ধ নয়।
সৃষ্টিকর্তা জয়দাতা অনন্ত আপনি
তার ভক্ত ত্রিজগতে কভু নহে হানি।"

(২) "দর্পহারী ভগবান তাহায় নাহি জান
তে কারণ দর্পমদে হয়েছ অজ্ঞান।"

(৩) "সর্ব্বভুত কর্ত্তা যে ভুত অধিকারী
তাহার সৃজন হয় দিবস শর্ব্বরী।"

(৪) "সংসার সৃজন কর্ত্তা জগত জনের ভর্ত্তা
হর্ত্তাকর্ত্তা যেই মহাশয়
যাহার আকারাকার হয় বুদ্ধি অগোচর
জ্ঞান নেত্রে যে হয় দর্শন।"

তিনি যে নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাসী ছিলেন এই কবিতাগুলি তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। জ্ঞানোদয়ের দু'বছর পরে লিপিমালা রচিত এবং জ্ঞানোদয়ে নয়, এখানেই তাঁর ধর্মমত প্রকাশিত হয়েছে।

টমাস, কেরী প্রমুখ মিশনারীদের বিবরণী থেকে রামরামের ধর্মবিশ্বাসের অন্য একটি চিত্র দেখা যায়। এঁদের মতে রামরাম অন্তরে খৃষ্টধর্মবিশ্বাসী হলেও জাতি-ত্যাগের ভয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে পারেননি। টমাসের বিবরণী থেকে বোঝা যায় যে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে রামরাম খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন এবং রামরাম খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করায় তিনি খুব হতাশ হন। কেরী টমাসের মত অতটা আশাবাদী না হলেও তিনিও মনে করেছিলেন রামরাম শেষ পর্যন্ত খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন। তাই ১৭৯৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের চিঠিতে লেখেন, "I entertain a very high opinion of him [Ram Ram] as a coverted person, he is a man after my own heart."[৩৩]

রামরাম সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করতেন শুধু ওয়ার্ড, তিনি মনে করতেন, রামরাম "cringing and flattering"[৩৪] কিন্তু পরে তাঁর এই মত পরিবর্তিত

হয়, যখন রামরাম স্ব-ইচ্ছায় ধর্মসঙ্গীত ও প্রচারপুস্তিকা লিখে দেন। ওয়ার্ড দিনলিপিতে লিখেছেন, [Ram Ram] "voluntarily translated English hymns in to Bengali."[৩৫]

১৮০২ খৃষ্টাব্দে রাইল্যাণ্ডকে লেখা রামরামের চিঠিটি তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে একটি মূল্যবান দলিল। চিঠিটি বি. এম. এস. (লণ্ডন)-এর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। এ চিঠিতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, "হারে সাহেব আমি বড় অভাগ্যমন্ত এই মঙ্গলাক্ষণ এদেশে প্রচার হওনের আরম্ভ সমাচার প্রথমতঃ যখন প্রথম শ্রীযুত ডাক্তার তামস সাহেব আইল অল্পদিন পরে আমি তাহার মনসী হইয়া তাহাকে এদেশীয় লেখাপড়া কওয়া বলা জো কিছু দস্তুর পাই শিক্ষাইলাম পরে তিনি হিত উপদেশ করিতে লাগিলেন এবং মঙ্গলাক্ষণের দুই তিন কেতাব মেছল্লম তরজমা করিলেন প্রথমে মতিউ অবধি তরজমা আরম্ভ হইল পরে কেরি সাহেব আইলেও আমি সেইমত করিলাম এবং মঙ্গলাক্ষণ সেই মত প্রচার হইতেছে কিন্তু আমি যে মত তামস সাহেবের আমলে এখনও সেইমত মঙ্গলাক্ষণ কতক২ বুঝিতে পারি লোকের দিগের শুনাইতে পারি কিন্তু জাইতের প্রেম ত্যাগ করিতে পারিতেছি না এই হয়েছে আমার বিসম…"[৩৬] ডঃ ইয়ং মন্তব্য করেন, "In their [Baptists] eyes he was still a heathen outwardly but inwardly somehow centred or in the process of centring upon Jesus Christ."[৩৭] ডঃ ইয়ং-এর এই অনুমান সঠিক বলে মনে হয় না, কারণ ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে লেখা। কেরীর চিঠিতে জানা যায়, "a German Merchant in Serampore was brought under the concern of the soul by a conversation with Ram Boshoo, who still remains a heathen"[৩৮] বাহ্যিক ও আন্তরিক উভয়ভাবেই রামরামের খৃষ্টধর্ম প্রীতি সমান ছিল কিন্তু তা তাঁর ধর্মবিশ্বাসের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাঁর রচন, চিঠি প্রভৃতি থেকে বোঝা যায় খৃষ্টধর্ম প্রচারে সহায়তা তিনি স্ব-ইচ্ছাতেই করেন। তিনি বোধ হয় চেয়েছিলেন নিজের বিবেক ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে প্রত্যেকে তার ধর্মবিশ্বাস গড়ে তুলুক। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারও ওপর ধর্মের অনুশাসন চাপানো অমানবিক।

হিন্দুধর্ম ও সমাজের সংস্কার হোক তা তিনি কায়মনোবাক্যে চেয়েছিলেন কিন্তু এ বিষয়ে আন্দোলনে ব্রতী হবার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। তাই মিশনারীদের সংস্কার প্রচেষ্টায় তাঁর আন্তরিক সমর্থন ছিল। তিনি নিজে ব্রহ্মবাদী হলেও তাঁর মতবাদ প্রচারে উদ্যোগী হতে পারেননি। তার কারণ, মনে হয়, এই প্রচারে নেতৃত্ব দেবার মত ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল না। তাঁর রচনা পড়ে মনে হয় সব উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে যুক্তিবাদী চিন্তা প্রসার লাভ করুক এটাই বোধ হয় তাঁর কাম্য ছিল। জাতিভেদ কুসংস্কার প্রভৃতির কুপ্রভাব থেকে

সমাজকে মুক্ত করার প্রয়াসকে তিনি আন্তরিকভাবে সমর্থন করতেন। সামাজিক অপশাসনকে আঘাত হানায় তাই তিনি স্বেচ্ছায় যোগ দেন। কিন্তু কোনদিনই চাননি দেশের সমাজের কাছ থেকে, মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে। তিনি ভালোভাবেই জানতেন দূরে সরে গিয়ে সমাজের কখনই মঙ্গল করা যাবে না।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ রামরামের তিরোধানের পর রামমোহনের মত বিরাট প্রতিভার আবির্ভাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মচিন্তা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে রামমোহন যে আলোড়নের সৃষ্টি করেন তারই সংঘাতে উনিশ শতকের ভারত গড়ে ওঠে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান প্রথম নয়। উনিশ শতকের প্রথম দু' দশকে মিশনারীরা ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতবৃন্দ সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়াসের যে সূচনা করেন তারই অভিজ্ঞতার প্রভাব রামমোহনের কর্মধারার দিকনির্ণয় করে দেয়। রামমোহনের জীবন, কর্মধারা, ধর্মমত প্রচার, উপাসক সম্প্রদায় গঠন প্রভৃতি সুপরিকল্পিত-ভাবে একটি নির্দিষ্ট পথে এগিয়েছে। রামরামের সঙ্গে এখানেও তাঁর বিরাট পার্থক্য। পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিচার করে তিনি কাজ করেছেন এবং কোন কাজকেই তাঁর বৈষয়িক প্রতিষ্ঠালাভের পথে অন্তরায় হতে দেননি। রামরামের মত শিক্ষালাভের সুযোগ হতে বঞ্চিত হতে হয়নি তাঁকে, প্রথাগত উচ্চশিক্ষা সমাজের অভ্যন্তরে থেকেই গ্রহণ করেন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর তাঁর ধর্মমত প্রচারে ব্রতী হন। সংস্কৃতের মাধ্যমে হিন্দুধর্ম এবং আরবী ফার্সীর মাধ্যমে ইসলাম সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন এবং ১৮০০ খৃষ্টাব্দের আগেই বেদভিত্তিক ব্রহ্মবাদী ধর্মবিশ্বাস তাঁর মনে সুগঠিত হলেও বৈষয়িক ব্যাপার চিন্তা করে তিনি ১৮১৫র আগে তাঁর ধর্মমত প্রচারে সক্রিয় হননি।

১৮০২—০৩ সালে ইংরেজ রাজকর্মচারীর নির্ভয় সান্নিধ্যে থেকে তিনি প্রথম ধর্ম সম্পর্কে তাঁর চিন্তা প্রকাশে ব্রতী হন। কিন্তু বইটি বাংলায় প্রকাশে আগ্রহী হননি। গ্রন্থটি লিখিত হয় ফার্সী ভাষায়। বইটির নাম তুহ্‌ফাৎ-উল-মুওহাহিদিন্। প্রধানত মুসলমানদের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে বইটি ফার্সীতে লিখিত হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে তিনি জনপ্রিয়তাও অর্জন করেন। মিশনারীদের বিবরণীতে আছে, 'so well versed in Persian that he is called Moulavi Rama mohun roya"[৩৯] শ্রীরামপুরের মিশন থেকে ইতিমধ্যে বাংলা গদ্যপুস্তক প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়েছে, তিনি যদি বইটি বাংলায় লিখতেন অথবা অনুবাদ করাতেন তবে বাংলার বৃহত্তর সমাজের কাছে তাঁর ধর্মমত অনেক আগে থেকেই প্রচারিত হতে পারত।

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে রামমোহনের কয়েকটি অভিমত গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়।[৪০] তিনি মনে করেন সকল ধর্মেই জগতের কর্তা একজন

পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ঈশ্বর অভিমুখী। আত্মা ও পরলোকে বিশ্বাস সকল ধর্মের ভিত্তি। পরিবেশ ও শিক্ষার ফলে বিশেষ বিশেষ দেবতা, মহাপুরুষ, আচার, অনুষ্ঠান, শাস্ত্র ও উপাসনায় অনুরক্ত হয় সাধারণ মানুষ। রামমোহন জানান ঈশ্বরই এ বিশ্বের সবকিছুর আদি কারণ, ধর্মগুরুর প্রত্যাদেশাদি গৌণ কারণ। অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত, সংস্কার প্রভৃতিতে নির্ভর করা উচিত নয়। স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান। রামমোহনের ধর্মীয় চিন্তাধারার যে সূচনা হয় এই বইটিতে তা উত্তরকালে সুপরিণত হয়েছে ব্রহ্মবাদী মতের প্রচারের মাধ্যমে। কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার বইটি বাংলায় লিখিত বা প্রচারিত না হওয়ায় বেশীর ভাগ মানুষ তাঁর চিন্তাধারার সঠিক পরিচয় লাভে বঞ্চিত হয়। গোঁড়া হিন্দুরাও তাঁর সম্বন্ধে অপচারের সুযোগ পায়। অভিজাত মুসলমান ও কিছু হিন্দু ছাড়া ফার্সী ভাষা তখন বিশেষ কেউ জানত না। কেরীর অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় দরিদ্র মুসলমানেরাও বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা জানত না। ফলে রামমোহনের বইটি সীমিত গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে প্রচারের সুযোগ পায়। অথচ এই সময় রামরাম লিপিমালার মাধ্যমে পরম ব্রহ্মের কথা এবং যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত ধর্মমতের প্রচার বাংলা ভাষায় করতে দ্বিধা করেননি। রামরামের সঙ্গে রামমোহনের বলিষ্ঠ কণ্ঠ যুক্ত হলে দেশ ও সমাজের অভ্যন্তরে সংস্কারমুক্ত ধর্মচিন্তা সহজে প্রবেশ করার সুযোগ পেত।

এরপর বিস্ময়করভাবে রামমোহন বারো বছর একেবারে নীরব থাকেন। শিক্ষালাভ বা শাস্ত্রীয় চর্চার জন্য এ নীরবতা নয়। বৈষয়িক ক্ষেত্রে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ নীরবতা। বাংলা গদ্য ইতিমধ্যে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রচেষ্টায় সুপ্রতিষ্ঠার পরে অনেকটা এগিয়েছে। ইংরেজ রাজকর্মচারী ও কলকাতার ধনী সমাজ বাংলাকে সহজে আর অবজ্ঞা করতে পারে না। দেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি সরকারের উপেক্ষা অনেকটা স্তিমিত রয়েছে। শিক্ষা প্রসারে মিশনারীদের প্রচেষ্টার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া শুরু হয়েছে। কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করে এই সময় (১৮১৫ খৃঃ) রামমোহন আসেন কলকাতায় বাস করতে।

অনুকূল পরিবেশের সুযোগে তিনি বাংলায় বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতির প্রচার শুরু করেন। খৃষ্টধর্মের সারবত্তা পর্যালোচনারও সুযোগ পান এ সময়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের সূচনা হলে এবং হিন্দু কলেজ ও শ্রীরামপুর কলেজের মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা হলে তিনি তাঁর নিজের ধর্মমত প্রচার ও অপরের মতের বিরূপ সমালোচনা শুরু করেন। দেশীয় গোঁড়া সমাজ ও খৃষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেধে যায়। অবশেষে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রহ্মবাদী উপাসক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু তাঁর এই সম্প্রদায় মুষ্টিমেয় ধনী পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ রইল। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার কোন যোগসূত্র স্থাপিত হল না। এমনকি উদার মতাবলম্বী হিন্দু পণ্ডিতেরাও তাঁর উপাসক সম্প্রদায়ের প্রতি উৎসাহ দেখাননি।

ব্রহ্মবাদী চিন্তায় তাই রামরাম ও রামমোহনকে একস্তরে আনা যায় না। রামরামের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল দেশীয় দরিদ্র সমাজে আর রামমোহনের গোষ্ঠী ছিল সীমিত। রামমোহনের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ছিল বিপুল। রামরাম ছিলেন স্বলপবুদ্ধিসম্পন্ন। যদিও একই সময়ে তাঁরা কাজ করেন, কিন্তু তাঁদের পারস্পরিক যোগ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। রামমোহন রামরাম বা দেশীয় পণ্ডিতদের সম্পর্কে বিস্ময়করভাবে নীরব। দীর্ঘদিন থেকে এঁদের পারস্পরিক যোগ সম্পর্কে নানা অনুমান প্রচলিত আছে, যা সঠিক তথ্য উদ্ঘাটনের কাজকে অনেকটা ব্যাহত করে। এ প্রবণতা এখনও আছে, যেমন ডেভিড কফ্ লিখেছেন, "Rammohan's idea of theistic Brahma, the cornerstone of his reform movement, was alrerdy expounded in published tracts betwen 1800-1802 by Ramram Basu."[৪১]

ডেভিড কফের এই বক্তব্য যে নিছক অনুমানভিত্তিক তা সহজবোধ্য। রামরাম tract-এ কোন ধর্মমত প্রকাশ করেননি, করেছেন লিপিমালায়। কিন্তু রামরাম কোন ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে তা করেননি। তাই রামমোহনের মত ও অভিব্যক্তি থেকে এ সম্পূর্ণ আলাদা। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক তাই টানা যায় না। কফ্ discover বা invention[৪২]-এর যে কথা বলেছেন তা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর, কারণ রামরাম বা রামমোহন কেউই এই চিন্তাধারার নতুন রূপ দেননি। বৈদান্তিক মতবাদের চর্চা ও শিক্ষা বেনারস, নবদ্বীপ নাটোর প্রভৃতি বাংলার বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল এবং বৈদান্তিক পণ্ডিতের সংখ্যা বাংলাদেশে কখনও অপ্রতুল হয়নি। বাংলার সাধারণ মানুষের কাছেও তা অজ্ঞাত ছিল না। সে যুগের একটি দুষ্প্রাপ্য বেদান্তের পুঁথি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।[৪৩] এর ভাষার স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা দেখে মনে হয় না যে বেদান্তের ধারণা বাংলার মানুষের আগে ছিল না। কফ্ বলেছেন, "Rammohan Roy seems Ramram's true successor. Both preferred to reinterpret their own religious tradition rather than to accept an alien faith. Both chose the more uncertain path of cultural purification and condemned members of their own elitist class for rationalising the existence of moral and social evil. In consequene, both shared the contempt of Brahman community. Their growing cultural alienation and marginality marked them as a intelligensia.[৪৪] কফের এই মন্তব্য

তথ্যভিত্তিক বা তর্কাতীত নয়। উভয়ের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক এবং দেশীয় সমাজের সঙ্গে সম্পর্কও সম্পূর্ণ আলাদা। মিশনারীদের নির্দেশে রামরাম যা প্রচার করেছেন তা তাঁর নিজস্ব মত নয়, নিজের বিশ্বাস তিনি প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করেছেন লিপিমালায়। রামমোহনের অভিমত অনেক স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তবে উভয়েই আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন সংস্কারমুক্ত উদার ধর্মভিত্তিক সমাজ পুনর্গঠিত হোক। দেশীয় সমাজের সঙ্গে উভয়ের সম্পর্কও ছিল ভিন্নরূপ। রামরাম সমাজের অভ্যন্তরে থেকে সামাজিক নির্যাতন সহ্য করেন। রামমোহন ছিলেন সমাজচ্যুত, সমাজের রোষ বা বিরূপতা তাই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের অনুমানভিত্তিক প্রয়াস তাই সমকালীন পরিবেশ পর্যালোচনাকে অহেতুক জটিল করবে, বিশ্লেষণমুখী করবে না।

উল্লেখপঞ্জী

১. Kopf, David : British Orientalism and Bengal Renaisance. p. 61.

২. Young, R. F. : Was Rammohan Roy True Successor of Ramram Basu. p. 1.

৩. Kopf, David Ibid.

৪. Young, R. F. Ibid.

৫. Kopf, David Ibid.

৬ বসু, রামরাম, প্রতাপাদিত্য চরিত্র : ভূমিকা

৭. চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার : মুনশী রামরাম বসু। পরিশিষ্ট, পৃ. ১০০

৮. Young, R. F., Ibid, p. 4.

৯. উইলিয়াম কেরীর দিনলিপি, ১৪ই নভেম্বর (পাণ্ডুলিপি)।

১০. চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার : রামরাম বসুর চিঠি, পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত।

১১. B. M. S., Periodical Accounts, Vol. II, p. 42.

১২. Lewis, C. B. : Life of John Thomas. p. 365.

১৩. B. M. S., Ibid, p. 65—66.

১৪. বসু, রামরাম : ধর্মপুস্তকের দূত

১৫. B. M. S., Ibid, p. 379.

১৬. Ibid, p. 111.

১৭. Potts, E. D. : British Baptist Missionaries in India. p. 244
১৮. Ward, W. : Journal, 24 Nov. 1800 (Mss.)
১৯. Ibid, 1 Aug. 1801 (Mss.)
২০. Basu, R. R. : Jnanoday or Rise of Wisdom, tr. by Carey (Mss.)
২১—২৩. Ibid.
২৪. Young, R. F. : Ibid, p. 10.
২৫. চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার : পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২
২৬. তদেব, পরিশিষ্ট
২৭. বসু, রামরাম : লিপিমালা। পৃ. ৫২
২৮. তদেব, পরিশিষ্ট
২৯-৩২. তদেব
৩৩. B.M.S., Periodical Accounts, Vol. III, 16 Dec. 1793.
৩৪-৩৫. Ward, W. : Journal (Mss.)
৩৬. চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার : পূর্বোক্ত
৩৭-৩৮. Young, R. F. : Ibid.
৩৯. Chattejee, S. : William Carey and Serampore. p. 16.
৪০. বিশ্বাস, দিলীপকুমার : রামমোহন সমীক্ষা। পৃ. ৪৮
৪১. Kopf, David : Ibid, p. 121.
৪২. Ibid, p. 124.
৪৩. চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার : (সম্পাদিত), একটি দুষ্প্রাপ্য বাংলা গদ্য পুঁথি বেদান্তসার।
৪৪. Kopf, David : Ibid, p. 126.

পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

(১৭৬২-১৮১৯)

উনিশ শতকের নবজাগরণের ঊষায় বাংলার ভাগ্যাকাশ নানা জ্যোতিষ্কের সমাবেশে উদ্ভাসিত। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে সরকারি কাজের সূত্রে এসেছেন মানবতাবাদী পণ্ডিতবৃন্দ, এসেছেন নিপীড়িত মানুষের উদ্ধারের আশায় ধর্মযাজকের দল, আর এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ধনী সম্প্রদায়ের কিছু মনীষী। নবজাগরণের ইতিহাস সশ্রদ্ধভাবে মনে রেখেছে এঁদের সকলকে। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে জোন্স, কেরী, কোলব্রুক, হেয়ার, ডাফ্, রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ মনীষীবৃন্দের নাম। কিন্তু চিন্তাধারার বলিষ্ঠতায়, দৃষ্টিভঙ্গির উদারতায়, পাণ্ডিত্যের উৎকর্ষতায় ও মানবপ্রেমের মহৎ আদর্শে সমুজ্জ্বল একটি পণ্ডিতগোষ্ঠীও আবির্ভূত হয়েছিলেন এই সময়; কোন বিস্তারিত আলোচনা এঁদের সম্বন্ধে পাওয়া যায় না, যদিও নবজাগরণের সূচনায় এঁদের অবদান মোটেই নগণ্য নয়। দারিদ্র্যের জন্য এঁরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা শ্রীরামপুর মিশনে চাকুরী গ্রহণ করেন অতি অল্প বেতনে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশন এঁদের সহায়তায় বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা করে। এইসব পণ্ডিতদের সুতীক্ষ্ণ লেখনীই সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধের বীজ রোপণ করে। যুগনায়ক রামমোহনের বিরাট ব্যক্তিত্বের পাশে এঁরা অহেতুক বেশী ম্লান হয়েছেন পরবর্তীকালের অবহেলায়। তাই এঁদের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু এইসব পণ্ডিতদের অবদানের সঠিক বিবরণ না জানলে উনিশ শতকের নবজাগরণের ইতিহাস কখনই সম্পূর্ণ হবে না।

এইসব পণ্ডিদের মধ্যে আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন সর্বপ্রথম। জন ক্লার্ক মার্শম্যান তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন,

"At the head of the establishment of pundiis (at the college of Fort William) stood Mrityunjoy, who although a native of Orissa, usually regarded as the Baeotia of the country, was a colossus of literature. He bore a strong resemblence to our great lexicographer (Dr. Johnson) not only by his stupendous acquirements and soundness of his critical judgement but also in his rough features and unwieldy figure. His knowledge of Sanskrit classics was unrivalled, and his Bengali composition has never been surpassed for ease, simplicity and vigour."[১]

মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে এই উক্তির ঐতিহাসিক মূল্য বড় কম নয়। বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ-লগ্নে তাঁর চেয়ে বেশী অবদান আর কারুর ছিল বলে মনে হয় না। সম্ভাবনাময় শক্তিশালী বাংলা গদ্যের তিনিই যথার্থ প্রথম রূপকার। প্রকৃত দরদী শিল্পীর পরিচয় তাঁর মধ্যেই প্রথম পাওয়া যায়। কিন্তু এই মহামনীষী আজও আমাদের সুপরিচিত নন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতরূপে যোগ দেন। শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম কেরী ছিলেন এই বিভাগের অধ্যাপক। কেরী সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে এই বিভাগেরও পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। এখানে অধ্যাপনার কাজ সুরু করার পরকেরী দেখেন শিক্ষাদানের সবচেয়ে বড় অন্তরায় পাঠ্য-পুস্তকের অভাব। কলেজের কর্তৃপক্ষকে এই অসুবিধার কথা জানিয়ে কেরী তাঁর পণ্ডিতদের বাংলায় পুস্তক রচনার জন্য উৎসাহিত করেন এবং রচয়িতাদের পারিতোষিক দেবার ব্যবস্থা করেন। কেরী ও কলেজের অনুপ্রেরণায় রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোলোকনাথ শর্মা, তারিণীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, রামকিশোর তর্কচুড়ামণি, হরপ্রসাদ রায় ও কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন বাংলা গদ্য সাহিত্যের অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৮০২ খৃষ্টাব্দে। বইটি সংস্কৃত বত্রিশ সিংহাসনের বাংলা অনুবাদ। বাংলা বত্রিশ সিংহাসন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অনুমোদিত হয় এবং মৃত্যুঞ্জয় দুইশত টাকা পারিতোষিক পান। বইটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে কেরী বলেন,

"Mrityunjoy, the head Pundit of the College, has translated from the Sanskrit language into the classical Bengali Prose the Buteesee Singhasan···They are works of considerable merit and such as deserves remuneration."[২]

সংস্কৃত ভাষায় মৃত্যুঞ্জয়ের পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তাঁর সমকক্ষ সংস্কৃত পণ্ডিত সে যুগে খুব অল্পই ছিলেন।[৩] ১৮০১ হ'তে ১৮১৬ পর্যন্ত বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু এখানে খ্যাতি বাড়লেও আর্থিক উন্নতি বিশেষ হয়নি। সেজন্য ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি তাঁকে কোর্ট পণ্ডিত হবার আহ্বান জানালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেননি। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই মৃত্যুঞ্জয় ফোর্ট উইলিয়ামের চাকুরী ত্যাগ করে সুপ্রিম কোর্টে যোগদান করেন। তাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণে কাউন্সিলকে সুপারিশ করার সময় কেরী মৃত্যুঞ্জয়ের উচ্চ

শংসা করে বলেন,

"In point of learning very few are his equals and no one with whom I have any acquaintance exceeds him."[৪]

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নটেনকে হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রে সাহায্য করার কাজে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তীক্ষ্ন বিচারবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের প্রভাবে অতি অল্প দিনের মধ্যেই মৃত্যুঞ্জয় ম্যাক্‌নটেনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হয়ে ওঠেন। ধনী হিন্দুদের মকদ্দমাপ্রিয়তা তাঁকে বিশেষ ব্যথিত করে। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেন, "ধনাঢ্য যত লোক সুপ্রিম কোর্টে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া সেই আদালত হইতে মুক্ত হইয়াছেন। ইহা ব্যতিরেকে অন্য কিছু দেখি নাই"।[৫] সুপ্রিম কোর্টে অবস্থান কালে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য হিন্দুশাস্ত্র বিচার করে বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান দেওয়া। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে তিনি উত্তর ভারতে তীর্থ ভ্রমণে বের হন এবং ফেরার পথে মুর্শিদাবাদের কাছে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। সমাচার দর্পণে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ দেখা যায় ১৯এ জুন, ১৮১৯-এর সংখ্যায়, "……পরে আট মাস হইল (মৃত্যুঞ্জয়) সুপ্রিম কোর্টের সাহেবদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তীর্থ দর্শনে গিয়া কাশী, প্রয়াগ, গয়া প্রভৃতি তীর্থদর্শন করিয়া বাটি আসিতে-ছিলেন, পথে মোং মুর্শিদাবাদের নিকট গঙ্গাতীরে জ্ঞানপূর্বক পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।"[৬] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর এই তিরোধান যেমন সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করে তেমনি তাঁর সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহেও দেখা দিয়েছে প্রচুর অসুবিধা।

মৃত্যুঞ্জয় বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা। রামমোহন বাংলা গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা এই মতবাদ প্রচার করে অনেকে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী সময়ের সাহিত্য সৃষ্টির প্রতি অবহেলা বা উপেক্ষা দেখিয়ে রামমোহনের গৌরব বা যশ বৃদ্ধি করা যায় না। তিনি বাংলা লেখা আরম্ভ করার অনেক আগেই রচিত নিদর্শন পাওয়া যায় গদ্যের এবং তিনি যখন লেখা আরম্ভ করেন তখন তাঁর সামনে এই সব রচনার নিদর্শন ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতরা লেখা সুরু করেন ১৮০১ খৃটাব্দে, এবং তাঁদের বইগুলি ছিল বিদেশী ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক। কিন্তু তা সত্ত্বেও বইগুলি সে-যুগের শিক্ষিতমহলে বিশেষ সাড়া জাগায়। কিছু বই-এর চাহিদা এতো বেশী হয় যে কয়েক বছরের মধ্যে দু'তিনটি সংস্করণ বেরিয়ে যায়। মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন এই লেখক গোষ্ঠীর সর্বপ্রধান। মৃত্যুঞ্জয় ও তাঁর সহযোগী পণ্ডিতবৃন্দের রচনায় বিষয়-বৈচিত্র্য শিল্পবোধ, বর্ণনার সরসতা, রচনা শৈলী প্রভৃতি যা প্রকাশিত হয়েছে তা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। মৃত্যুঞ্জয় ও অন্যান্যদের বাংলা গদ্যসাহিত্য রচনার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

১নং তালিকা[৭]

পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনা

গ্রন্থের নাম	বিষয়	প্রথম প্রকাশ	অন্যান্য সংস্করণ
১। বত্রিশ সিংহাসন	উপাখ্যান	শ্রীরামপুর ১৮০২	শ্রীরামপুর ১৮০৮, ১৮১৮
			লণ্ডন ১৮১৬
২। দায়রত্নাবলী	সমাজবিজ্ঞান	„ ১৮০৫	—
৩। হিতোপদেশ	উপাখ্যান	„ ১৮০৮	শ্রীরামপুর ১৮১৪
৪। রাজাবলী	ইতিহাস	„ ১৮০৮	„ ১৮১৪
৫। বেদান্তচন্দ্রিকা	ধর্ম	কলিকাতা ১৮১৭	—
(ইংরাজী অনুবাদ সহ)			
৬। প্রবোধচন্দ্রিকা	সাহিত্য	শ্রীরামপুর ১৮৩৩	শ্রীরামপুর ১৮৪০
(রচনা ১৮১১)			কলিঃ বিশ্বঃ ১৮৬২

২নং তালিকা[৮]

অন্যান্য পণ্ডিতবৃন্দের রচনা

লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	বিষয়	প্রথম প্রকাশ	
উইলিয়াম কেরী	নিউ টেষ্টামেণ্ট	ধর্ম	শ্রীরামপুর	১৮০১
	ওল্ড টেষ্টামেন্ট	„	„	১৮০১
	কথোপকথন	কাহিনী	„	১৮০১
	ইতিহাসমালা	,,	„	১৮১২
রামরাম বসু	রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত	জীবনী	,,	১৮০১
	লিপিমালা	পত্রগুচ্ছ	,,	১৮০২
গোলোকনাথ শর্মা	হিতোপদেশ	উপাখ্যান	,,	১৮০২
তারিণীচরণ মিত্র	ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট	কাহিনী	কলিকাতা	১৮০৩
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য জীবনচরিত	জীবনী	শ্রীরামপুর	১৮০৫
চণ্ডীচরণ মুন্সী	তোতা ইতিহাস	কাহিনী	,,	১৮০৫
রামকিশোর তর্কচুড়ামণি	হিতোপদেশ	উপাখ্যান	,,	১৮০৮
হরপ্রসাদ রায়	পুরুষ পরীক্ষা	কাহিনী	,,	১৮১৫

এই লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনাই ছিল সর্বোত্তম এবং বহু সম্ভাবনাময় বাংলা সাহিত্যের আবির্ভাববার্তা জানা যায় তাঁরই লেখার মধ্যে। ১৮০২ হতে ১৮১৭ মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় অনেকগুলি বাংলা গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁর জীবনাবসান যদি অকালে না হতো, তবে বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধি সে-সময়

আরও বেশী হতো। তিনি ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক এবং প্রকাশিত বাংলা পুস্তকের সংখ্যা ছিল তাঁরই সবচেয়ে বেশী। মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার মধ্যে 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'হিতোপদেশ' এই দুটি পরিচিত গল্পের সংকলন। দুটিই সংস্কৃত হতে অনুবাদ। সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের প্রাচুর্য্য ও যতি চিহ্নের কম ব্যবহার বই দুটি পাঠের অসুবিধা ঘটালেও সরসতা ও সাবলীল সহজ ভঙ্গির জন্য পাঠক মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করে। দায়রত্নাবলীতে[৯] প্রাচীন ভারতের রীতিনীতির সঙ্গে তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতির তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এই বইটিও সংস্কৃত হতে অনুবাদ। 'রাজাবলী'তে কলির সুরু হতে ইংরাজ অধিকার পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতীয় ভাষায় এটাই প্রথম মুদ্রিত ইতিহাস ; ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং জনপ্রিয়তার জন্য পরে এর আরও কয়েকটি সংস্করণ হয়। মৃত্যুঞ্জয়ের পৌত্র বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে 'রাজাবলী'র পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করেন।[১০] পাঠ্য পুস্তক হিসাবে প্রকাশিত হলেও ভাষার সরসতা ও প্রকাশভঙ্গীর সাবলীলতার জন্য বইটি সকলের কাছেই সুখপাঠ্য হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের পৌত্তলিকতা বিরোধী গ্রন্থের প্রত্যুত্তরে মৃত্যুঞ্জয় ইংরাজী অনুবাদ সহ বেদান্তচন্দ্রিকা প্রকাশ করেন। পুস্তকে রচয়িতার নাম না থাকলেও স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় রিপোর্ট এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ক্যালক্যাটা রিভিয়ুতে প্রকাশিত প্রবন্ধ হতে জানা যায় এটি মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা।[১১] 'প্রবোধচন্দ্রিকা' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে এটি রচিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর জীবদ্দশায় পুস্তকটি হয়নি। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হতে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং পরে এর অনেকগুলি সংস্করণও বের হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রবোধচন্দ্রিকার একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করে।

মৃত্যুঞ্জয়ের দুর্ভাগ্য সাহিত্য সমালোচকদের সকলে তাঁর প্রতি সুবিচার করেন-নি। রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ সমালোচকগণ মৃত্যুঞ্জয়ের পণ্ডিতী ভাষার উৎকটত্ব দেখাতে গিয়ে প্রবোধচন্দ্রিকা হতে যে অতি সমাসবদ্ধ বাক্যের উল্লেখ করেছেন মৃত্যুঞ্জয় তা উদাহরণরূপে ব্যবহার করেছেন। তাঁর নিজস্ব রচনায় ঐরূপ সমাসবদ্ধ বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় না।[১২] সমালোচকদের এরূপ ভুলের জন্য বহুদিন পর্যন্ত সাধারণ পাঠকমহলে মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা ছিল।[১৩] পরবর্তীকালের সমালোচকরা কিন্তু তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার সঠিক মূল্যায়নে সচেষ্ট হয়েছেন। শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন এবং সাহিত্য সাধক চরিতমালায় তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ব্রজেনবাবু বলেছেন, "বাংলা গদ্যের যখন নিতান্ত শৈশবাবস্থা, তখনই তিনি (মৃত্যুঞ্জয়) বিভিন্ন গদ্যরীতি লইয়া পরীক্ষা

চালাইয়াছেন এবং তাঁহার বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন রীতিতে রচনা করিবার দুঃসাহস দেখাইয়াছেন।"[১৪] তাঁর মতে মৃত্যুঞ্জয় বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী এবং রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ উক্তি মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।[১৫] শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বলেন, "তিনি (মৃত্যুঞ্জয়) যেমন একদিকে সাধু ভাষার আদি লেখক, অপরদিকে তিনি তেমনি চলতি ভাষার আদর্শ লেখক।.....এ ভাষা সজীব, সতেজ, সরল, সচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গতিমুক্ত, ইহার শরীরে লেশমাত্র জড়তা নাই, এবং এ ভাষা সাহিত্য রচনার উপযোগী।"[১৬] পরবর্তীকালের সমালোচকগণ স্বাধীনভাবে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার বিশ্লেষণ করে তাঁর সাহিত্য-স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করেননি। বিশেষ করে তাঁর প্রবোধচন্দ্রিকার প্রশংসা করে ডাঃ সুশীলকুমার দে বলেছেন,

Indeed Probodh Chandrika exemplifies one important aspect of the development of prose style in this period and brings into clear relief the long continued struggle between the plain and the ornate style out of which is evolved modern prose."

ব্রজেনবাবুর মত তিনিও বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির পূর্বাভাষ মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে দেখেন এবং বলেন,

".....his narrative style, though sanskritised, often assumes an ease and dignity reminding one of the later style of Vidyasagar."[১৭]

সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে, "মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার মধ্যে সাধুভাষা ও সংস্কৃত-রীতির প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়।"[১৮] ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "গ্রাম্য জীবনের এমন অনাবৃত বলিষ্ঠ মূর্তি অঙ্কনের নাটকীয় কলাকৌশল একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে পাওয়া যায়।...প্রবোধ চন্দ্রিকায় কৃষাণীর যে মর্মান্তিক দুঃখ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মত প্রাণস্পর্শী বর্ণনা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গোষ্ঠী দূরের কথা, বিদ্যাসাগরের পূর্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যে মিলিবে না।"[১৯]

বিভিন্ন দিক দিয়া বিশ্লেষণ করে তাঁর রচনার মূল্যায়ন করলে দেখা যায় বিস্ময়কর উৎকর্ষতা এবং বিভিন্ন রীতির সমন্বয়ের সার্থক প্রয়াস। বিভিন্ন গদ্যরীতি নিয়ে তিনি যে পরীক্ষা করেছেন তার মধ্য দিয়ে তিনি শুধু দুঃসাহসিকতারই পরিচয় দেননি, দরদী সাহিত্যশিল্পীর গভীর মমত্ববোধও প্রকাশ করেছেন। তিনি ভাষার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বোধ হয় গভীর-ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই শিল্পিসুলভ মনোভাবে তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ

ফল ভবিষ্যৎ অনুগামীদের হাতে তুলে দেন। সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় জ্ঞানী সংস্কৃতকে যে প্রাধান্য দেবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কিন্তু সংস্কৃত পণ্ডিতের পক্ষে খাঁটি বাংলা রীতির সার্থক রূপদান করা ও আরবি, ফার্সী প্রভৃতি ভাষাকে উপেক্ষা না করার ঔদার্য দেখানো সত্যই বিরাট মহত্ত্বের পরিচয়। সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য গড়ে তোলার স্বপ্ন তাঁর রচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সে-যুগে, বিশেষ করে তাঁর জীবিতকালে, তাঁর সমকক্ষ যে কেউই ছিলেন না একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মৃত্যুঞ্জয় সে যুগের একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। উত্তরবঙ্গের নাটোরে তিনি শাস্ত্রশিক্ষা লাভ করেন। তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসার পর হতেই তাঁর পাণ্ডিত্যের ও শাস্ত্রজ্ঞানের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে কলকাতায় প্রভাবশালী পণ্ডিত সমাজ গড়ে ওঠেনি। নবদ্বীপ, নাটোর, কৃষ্ণনগর, গুপ্তিপাড়া, খানাকুল প্রভৃতি স্থানেই তখন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বাস করতেন। হিন্দু সমাজের শাস্ত্র বিধান এইসব অঞ্চল হতেই হতো। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও কলকাতার বিশিষ্ট ধনী সম্প্রদায় গড়ে ওঠার পর হতেই বিভিন্ন অঞ্চল হতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা উপার্জনের আশায় কলকাতায় আসতে থাকেন এবং কলকাতায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সমাজ গড়ে ওঠে। এইসব পণ্ডিতদের প্রথম দলেই মৃত্যুঞ্জয় নাটোর হতে কলকাতায় আসেন এবং কলকাতার পণ্ডিত সমাজের মধ্যমণির আসন লাভ করেন। সে-সময়ে এদেশে ন্যায় ও স্মৃতিচর্চার প্রাধান্য পাওয়ায় বেদের চর্চা বিশেষ সীমিত হয় এবং রামমোহনের প্রচেষ্টাতেই বেদচর্চা আবার প্রসার লাভ করে। মৃত্যুঞ্জয়ও বেদচর্চার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর বাগবাজারের বাসগৃহে বেদান্তাদি শাস্ত্রালোচনার কথা রামমোহন তাঁর 'কবিতাকারের সহিত বিচার' পুস্তিকায় একস্থলে উল্লেখ করেছেন, "...ঐ সকল মূল উপনিষদ ও আচার্য্যের ভাষ্য এবং বেদান্ত দর্শন ও তাহার ভাষ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের বাটীতে এবং কালেজে ও অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট এই দেশেই আছে.....।"[২০] রামমোহনের এই উল্লেখ হতেই বোঝা যায় মৃত্যুঞ্জয়ের বাটীই ছিল কলকাতার শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্রস্থল। উইলিয়াম ওয়ার্ড তাঁর গ্রন্থে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের চতুষ্পাঠীর বিষয় যা উল্লেখ করেছেন তাতে দেখা যায় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বাগবাজারে মৃত্যুঞ্জয়ের চতুষ্পাঠীতে ১৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করত।[২১] বেদান্ত ও উপনিষদে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় ১৮০২ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'বত্রিশ সিংহাসনের' মধ্যেই পাওয়া যায়। এই বই-এ এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, ".....তিনি এক পরমেশ্বর তাহার স্বরূপ এই সর্ব্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা কার্য্যরূপে এবং কারণরূপে অভিব্যক্ত সকলের অন্তঃকরণ ব্যাপার সাক্ষী পাদহীন অথচ সর্বত্রগ এবং পাণিহীন

সর্বগ্রাহী নেত্রহীন সর্বদর্শী শ্রোত্রহীন সর্বশ্রোতা……”[২২] এই উদাহরণ হতেই বোঝা যায় রামমোহনের আগেই মৃত্যুঞ্জয় বেদচর্চার প্রসারে যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বেদান্তচন্দ্রিকার মধ্যেও তাঁর জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় দেয়। বেদান্তচন্দ্রিকা মাত্র আড়াই শত খণ্ড মুদ্রিত হয়েছিল বলে সে-যুগে বহুল প্রচারের সুযোগ পায়নি। ‘ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার’ নামক পুস্তিকায় রামমোহন বইটির সমালোচনা করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে ক্যালক্যাটা রিভিয়ুতে বেদান্ত সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে বেদান্তচন্দ্রিকার সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়।[২৩] ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কার ‘সাংখ্য ভাষা সংগ্রহ’ নামক যে পুস্তকটি প্রকাশ করেন তাতে মৃত্যুঞ্জয়েরও অবদান ছিল অনেকখানি। ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া এ সম্পর্কে লেখে,

“……The Sankhya Provuchana has also been published by them in Bengali ; but for the translation the world is indebted to Mrityunjoy and Ramjay Turkulankar the late and the present chief pundits of Supreme Court.”[২৪]

পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের খ্যাতির জন্যই তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের পণ্ডিতের পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। মৃত্যুঞ্জয় এ কাজে বিশেষ প্রজ্ঞা ও দক্ষতা দেখাতে পেরেছিলেন বলেই বিচারক ম্যাক্‌নেটনের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন।

শিক্ষক হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের বিস্তৃত পরিচয় যদিও জানা যায় না, তবুও তাঁর চতুষ্পাঠীর যে খ্যাতি ছিল তা রামমোহনের রচনায় নামোল্লেখের মধ্য দিয়েই জানা যায়।[২৫] ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের যে সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার জন্য মৃত্যুঞ্জয়ের কৃতিত্ব অনেকখানি। কেরীর মত বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত তাঁর পদপ্রান্তে বসে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করেন ও তাঁর প্রশংসায় কেরী ছিলেন পঞ্চমুখ। শুধু পাণ্ডিত্যের জোরেই যে তিনি কেরীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন তা নয়, শিক্ষকতাগুণের দ্বারাও তিনি কেরীকে মুগ্ধ করেছিলেন।

সেই ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতার যুগে সমাজ শাসক ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে থেকে মৃত্যুঞ্জয় সমাজের পাশবিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে একটুও দ্বিধা করেননি। যদিও সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা নিয়ে সংস্কারের কোন অন্দোলনের সূচনা করেননি, তবু ধর্মসম্মত সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে তাঁর অভিমত নির্ভীকভাবে প্রকাশ করেছেন। হিন্দু সমাজের পাশবিক প্রথা সমূহের অবসান করার জন্য মিশনারীদের যে প্রচেষ্টা ছিল তার প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। শাস্ত্রীয় অভিমত সংগ্রহে তিনি তাঁদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান তাঁর “সতীদাহ”

প্রথা বন্ধ করা বিষয়ে। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেন তা সে-যুগে সবচেয়ে বেশী মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়েছিল। রামমোহনের পূর্বেই ১৮১৭ সালে তিনি এই মত দেন। 'সতীদাহ প্রথা' বন্ধ করার জন্য মিশনারীরা বহু পূর্ব হতেই জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা সুরু করেন। এঁদের চাপেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাস্ত্রীয় অভিমত সংগ্রহে আগ্রহী হয়। সুপ্রিম কোর্ট মৃত্যুঞ্জয়কে নির্দেশ দেয় এই প্রথা অনুমোদনকারী শাস্ত্র বিচার করে তাঁর অভিমত জানাতে। তিনি ৩৩টি বিভিন্ন শাস্ত্র বিচার করে দেখান, কোন শাস্ত্রই এই প্রথাকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে নির্দেশ দেয়নি। তাঁর মতে এর চেয়ে আমরণ বৈধব্যব্রত পালন অনেক বেশী শ্রেয়।

তিনি ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সমস্ত কাজের সঙ্গেই তাঁর যোগাযোগ ছিল। স্কুল বুক সোসাইটির তিনি একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে এদেশে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষা প্রসারে তিনি ছিলেন সবিশেষ আগ্রহী। তাই তাঁকে হিন্দু কলেজের কর্মপরিষদের সদস্যরূপেও দেখা যায়।

মৃত্যুঞ্জয়ের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। যে দু'চারটি কাহিনী তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত আছে তার সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ জানা যায়নি। এরূপ একটি কাহিনীর বর্ণনা এখানে দিচ্ছি। "জন্মস্থানের (মেদিনীপুর) প্রথানুসারে মৃত্যুঞ্জয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইয়াও প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যাদির পরে পলাণ্ডু পান্তাভাত আহার করিতেন। ছাত্ররা ভয়ে তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিত না—অন্যান্য পণ্ডিতদের নিকট গিয়া এই বিষয় তর্কালঙ্কার (বিদ্যালঙ্কার)-কে বলিতে বলিল।...পণ্ডিতেরা সাজিয়া গুজিয়া একদিন মৃত্যুঞ্জয়ের বাসায় গেলেন; কথা তুলিলেন যে দ্বিজাতির পক্ষে শাস্ত্রে পলাণ্ডু ভক্ষণ নিষিদ্ধ। মৃত্যুঞ্জয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন। তখন পণ্ডিতেরা বলিলেন, 'আপনি ত পেঁয়াজ দিয়া প্রত্যহ পান্তাভাত খাইয়া থাকেন'। মৃত্যুঞ্জয় তাহাও স্বীকার করিলেন। তখন পণ্ডিতেরা বলিলেন, 'আপনি মহাপণ্ডিত হইয়া, শাস্ত্র জানিয়া ও মানিয়া এমন কর্ম্ম করেন কেন?' তিনি বলিলেন, 'কি কর্ম্ম?' পণ্ডিতেরা বলিলেন, 'পলাণ্ডু ভক্ষণ।' মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন, 'আমি পলাণ্ডু ভক্ষণ করি তোমাদিগকে কে বলিল?' 'এইমাত্র আপনি বলিলেন—প্রত্যহ পেঁয়াজ দিয়া পান্তাভাত খাই।' 'কিন্তু পেঁয়াজ যে পলাণ্ডু এটা তোমরা কিসে বুঝিলে?' তখন পণ্ডিতমণ্ডলী মাথা চুলকাইতে লাগিল।'[২৬] কাহিনীটি কতটা সত্য তা জানি না, তবে তিনি যে যুক্তিহীন বিচার মানতেন না, তা সহজেই তাঁর সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। তিনি স্বাধীনচেতা ও আত্মনির্ভরশীল এবং স্ব-মর্য্যাদার প্রতি বিশেষ সচেতন ছিলেন এবং সেইজন্যই ধনী সম্প্রদায়ের কোন গোষ্ঠীর (রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদী) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

কেরী মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম সাক্ষাৎকারের বিবরণ জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায় যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে মৃত্যুঞ্জয়ের যোগদানের পূর্বেই উভয়ের পরিচয় হয়েছিল এবং কেরী তাঁকে চিনতে ভুল করেননি। কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে মৃত্যুঞ্জয়কে নিযুক্ত করার জন্য কেরী সুপারিশ করে যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি নিজে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতিভা বিকাশের সহায়তায় কেরীর দান অতুলনীয়। ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, সংস্কারহীন যুক্তিবাদী উদার মনোভাব, সামাজিক দুর্নীতি প্রতিরোধ করার আগ্রহ, গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্ব-বোধ প্রভৃতি সঞ্চার যে কেরীর সাহচর্য্যের ফলেই হয়েছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। এককথায় কেরীই মৃত্যুঞ্জয়কে আবিষ্কার করেন এবং সাধারণের কাছে তাঁকে প্রকাশ করেন। আবার সংস্কৃতের প্রতি কেরীর গভীর অনুরাগ এবং সংস্কৃত আশ্রয়ী ভাবধারার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাশীলতা মৃত্যুঞ্জয়ের জন্যই সম্ভব হয়েছিল। কেরীর সমগ্র বাংলা ও সংস্কৃত রচনার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের প্রভাব সুস্পষ্ট। বিশেষ করে কেরীর বাংলা 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা'র প্রধান রচয়িতা মৃত্যুঞ্জয় বলেই অনুমান করা হয়। 'কথোপকথন' সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন, "ইহার (কথোপকথনের) বহুস্থলেই দেশীয় লেখকের স্পর্শ পাওয়া যায়—এই দেশীয় ব্যক্তিটি মৃত্যুঞ্জয় হতে পারেন। কারণ এই যুগের রচনার মধ্যে একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়ই দৈনন্দিন জীবনের অতি পরিচিত পটভূমিকায় দাঁড়াইয়া সাধারণ বাঙ্গালীর দুঃখদুর্ভর ভাবনা কামনা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।"[২৭] সম্প্রতি কেরীর 'ইতিহাসমালা' সম্পাদনা করে ফাদার দ্যাতিয়েন বলেছেন, 'রচনাকালে কেরী এমন একজনের সাহায্য পেয়েছেন যিনি—কেরীর সম্ভবতঃ নিজেরই অজান্তে সত্যিকার সাহিত্যিক ছিলেন।[২৮] কোন জায়গায় উল্লিখিত না হলেও এই ব্যক্তিটি যে মৃত্যুঞ্জয় তা সহজেই অনুমান করা যায়, কারণ মৃত্যুঞ্জয়ই সে-সময় কেরীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন এবং সে-যুগে মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যেই প্রকৃত সাহিত্য চেতনার বিকাশ দেখা গিয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের সমসাময়িক যুগে সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রামমোহন। রাম-মোহন যুগের সূচনাতেই হয় মৃত্যুঞ্জয়ের তিরোধান। ১৮১৫ হতে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত মাত্র তাঁরা একত্রে কর্মক্ষেত্রে ছিলেন। বহু বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের পথপ্রদর্শক ও অনুপ্রেরণাদাতা। রামমোহন ভাবের গভীরতা, ভাষার শব্দ-সম্পদ, বাক্যবিন্যাসের উন্নত রীতির দ্বারা বাংলা গদ্য সাহিত্যকে যথেষ্ট উন্নত ও গৌরবান্বিত করেছিলেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তিনি মৃত্যুঞ্জয় প্রমুখ আদি গ্রন্থকারদের সহায়তা পেয়েছিলেন। পরম শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র মজুমদার 'বাংলা দেশের ইতিহাস' (আধুনিক যুগ) গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে

দেখিয়েছেন যে, বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক হিসাবে রামমোহনের নাম করা যায় না। তিনি বলেছেন, "নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে একথা স্বীকার করা কঠিন যে রামমোহন রায়ই বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক।"[২৯] তিনি মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহন উভয়ের ভাষার তুলনামূলক বিচার করে দেখিয়েছেন যে, মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা রামমোহন অপেক্ষা কোনক্রমে নিকৃষ্ট নয়।

এদেশে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করার প্রবর্তক বলে রামমোহন সুবিদিত এই প্রথা বন্ধ করার জন্য তাঁর মহান প্রচেষ্টা ও বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু এ ব্যাপারেও রামমোহন মৃত্যুঞ্জয়ের অনুগামী এবং মৃত্যুঞ্জয়ের কাছ হতেই তিনি এ ব্যাপারে প্রেরণা পেয়েছিলেন এ কথা বললেও বোধ হয় ভুল হয় না। এই কুপ্রথার প্রতি রামমোহনের বিরোধী মনোভাব বহু পূর্ব হতে থাকা সত্ত্বেও তিনি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এ সম্পর্কে কিছু করেননি। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে নানা শাস্ত্র বিচার করে মৃত্যুঞ্জয় এ প্রথাটি শাস্ত্রসম্মত নয় বলার পর ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ লেখেন। এদেশীয়দের মধ্যে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়েও মৃত্যুঞ্জয়ই প্রথম বলেন সহগমন শাস্ত্রানুযায়ী অবশ্য পালনীয় কর্তব্য নয়। এই ব্রতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রেরণা রামমোহন এখান থেকেই পেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে E. D. Potts বলেছেন, "This finding (the finding of Mrityunjoy that Sati had no Shastric authority) was greatly strengthened in 1818 when the brilliant brahmin reformer and scholar, Rammohan Roy, probably influenced by Vidyalankar's big pronouncement, publicly but belatedly entered the ranks of the abolitionists."[৩০]

পরবর্তীকালে রামমোহন তাঁর ইংরাজী পুস্তিকায় সহমরণ বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের অভিমত উদ্ধৃত করেন।[৩০ক] বেদান্তচর্চা ও মূর্তি পূজা বিষয়ে উভয়ের মত ছিল কিন্তু পরস্পরবিরোধী। রামমোহনের বেদান্ত গ্রন্থের সমালোচনা করে মৃত্যুঞ্জয় লেখেন বেদান্তচন্দ্রিকা। রামমোহন তার উত্তর দেন 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' নামক পুস্তিকায়। পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে। সহমরণ বিষয়ে শাস্ত্র বিচারে মৃত্যুঞ্জয় সে-সময় ব্যস্ত থাকায় তিনি তখন কোন উত্তর দেননি এবং তারপর তাঁর মৃত্যু হওয়ায় এবিষয়ে আলোচনা ওখানেই শেষ হয়।

প্রত্যক্ষভাবে মৃত্যুঞ্জয় তাঁর পরবর্তীকালকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করতে পারেননি, কারণ তিনি হিন্দুধর্ম বিশ্বাসকে নস্যাৎ করে অন্ধভাবে পাশ্চাত্য ভাবধারা অনুকরণের আদর্শ প্রচার করেননি বা গোঁড়া কুসংস্কারাচ্ছন্নের মত ধর্মের দোহাই দিয়ে কুপ্রথাকে সমর্থন করেননি। তাই গোঁড়া সমাজ বা আধুনিকতাবাদী কারও দলভুক্ত হননি। তবে তাঁর ধ্যানধারণা, সাহিত্যাদর্শ

প্রভৃতি অনেকেই পরোক্ষভাবে গ্রহণ করেন এবং তার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন রীতিনীতির যে পরীক্ষা তিনি সুরু করেন তার পরিপূর্ণ সার্থক রূপ দেখা যায় বিদ্যাসাগরের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে। গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে গভীর মমত্ববোধ ও আন্তরিকতা দেখা যায় তা তাঁর পূর্ববর্তী যুগে একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার মধ্যেই দেখা গিয়েছে। ধর্ম্ম ও সমাজের অভ্যন্তরে থেকেই বিদ্যাসাগর ধর্মের নামে অনাচারের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যেও ঠিক এরূপ প্রয়াস ছিল। অশাস্ত্রীয় প্রথা ও অনাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েও ধর্মের আশ্রয় তিনি ত্যাগ করেননি। Potts তাই বলেছেন, "Not only did he (Mrityunjoy) remain unconverted after sixteen years of intimate contact with Carey but also he was a foremost Public defender of the then orthodox Hinduism."[৩১]

মৃত্যুঞ্জয় প্রসঙ্গে সবচেয়ে দুঃখের কথা তাঁর জন্মবৃত্তান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতে পারিনি। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, না ওড়িয়া ছিলেন এবিষয়ে বিতর্কের সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। জন ক্লার্ক মার্শম্যান ও জর্জ স্মিথ মৃত্যুঞ্জয়কে ওড়িয়া বলে বর্ণনা করেছেন।[৩২] হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও তাঁকে ওড়িয়া বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৩] রামমোহন ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুঞ্জয়কে ভট্টাচার্য্য বলেছেন। নবজীবন পত্রিকায় লিখিত একটি প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকার এ সম্বন্ধে অনেকটা আলোকপাত করেন।[৩৪] তিনি বলেন যে, তিনি মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করেছেন তাঁর পৌত্র বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তাঁর মতে মৃত্যুঞ্জয় মেদিনীপুরের যে অংশে জন্মগ্রহণ করেন সেই অংশ তাঁর জীবদ্দশায় উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল এবং সেখানে বাংলা ও ওড়িয়া দুই ভাষাই প্রচলিত ছিল।

তিনি উভয় ভাষাই জানতেন। ফলে বিদেশীদের পক্ষে তাঁকে ওড়িয়া বলে মনে করা কিছু অসম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি বাঙ্গালী কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীসরকারের এই বক্তব্যের পর হয়তো কোন প্রশ্ন থাকতো না, যদি না তাঁর প্রবন্ধে কয়েকটি মারাত্মক ভুল দেখা যেতো। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ের উপাধি বিদ্যালঙ্কারের জায়গায় তর্কালঙ্কার লিখেছেন। তিনি লিখেছেন মৃত্যুঞ্জয় ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ৭২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় মারা যান ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে। তিনি আরও বলেছেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের আলাপ পরিচয় ছিল, অথচ বিদ্যাসাগর মৃত্যুঞ্জয় মারা যাবার এক বছর (১৮২০ খৃষ্টাব্দে) পরে জন্মগ্রহণ করেন। তাই মৃত্যুঞ্জয়ের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে সঠিক তথ্য না জানা পর্যন্ত এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করা শক্ত।

উল্লেখপঞ্জী

১। Marshman, J. C. : Life and times of Carey, Marshman and Word. I (1859), p. 180.

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ : সাহিত্য সাধক চরিতমালা। নং ৩ (১৩৫৩), পৃ. ১৩

৩। কেরী, ম্যার্শম্যান, রামকমল সেন প্রমুখ অনেকেই তাঁকে অদ্বিতীয় পণ্ডিতরূপে বর্ণনা করেছেন।

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ : সাঃ সাঃ চরিতমালা। নং ৩, পৃ. ১৬

৫। সমাচার দর্পণ, ৩১শে অক্টোবর, ১৮২৯

৬। ঐ, ১৯শে জুন, ১৮১৯

৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ : মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী
Rev. Long : Descriptive Catalogue (1855), p. 55

৮। ঐ, সাঃ সাঃ চরিতমালা। নং ১৪ (১৩৫৪) পৃ. ৬

৯। Rev. Long : Descriptive Catalogue (1855), p. 55

১০। সরকার, অক্ষয়চন্দ্র : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। নবজীবন, মাঘ, ১২৯৫, পৃ. ২৭৮

১১। Calcutta Review. July 1845, Vedantism — what is it ?

১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ : মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী

১৩। ঐ সাঃ সাঃ চরিতমালা। নং ৩ পৃ. ৪৬

১৪। ঐ ঐ পৃ. ৩৬

১৫। ঐ ঐ পৃ. ৪৫

১৬। সবুজপত্র, ফাল্গুন, ১৩২১

১৭। Dey, S. K. : History of Beng. Literatue (1962), p. 200, 202

১৮। সেন, সুকুমার : বাংলা সাহিত্যে গদ্য (১৩৪১), পৃ. ২৬

১৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত : উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য। পৃ. ৫৭

২০। রায়, রামমোহন : 'কবিতাকারের সহিত বিচার', রামমোহন গ্রন্থাবলী। অজিত ঘোষ (১৯৭৩), পৃ. ২১২

২১। Ward, William : A view of history. Vol. IV (1820), p. 495

২২। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ : মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী

২৩। Cal. Review, July, 1845, Vedantism—What is it ?

২৪। Friend of India (quarterly series), Vol. II, No. VII, p. 567

২৫। রায়, রামমোহন : কবিতাকারের সহিত বিচার

২৬। সরকার, অক্ষয়চন্দ্র : নবজীবন, মাঘ (১২৯৫), পৃ. ২৭৭

২৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত : ঊনবিংশ শতাব্দীর··· (১৩৬৩), পৃ. ১১৩৪

২৮। ফাদার স্তিয়েন : কেরী সাহেবের ইতিহাসমালা (১৯৭২)। পৃ. ৩১

২৯। মজুমদার, রমেশচন্দ্র : বাংলার ইতিহাস, আধুনিক যুগ (১৯৭১), পৃ. ৪১৭

৩০। Potts, E. D. : British Baptist Missionaries in India (1967), p. 148

৩০ক। Ray, Rammohan : Some remarks·····(1831) Eng. Works of Raja Rammohan Ray (Sadharan Brahma Samaj) (1934), p. 73 74

৩১। Do p. 232

৩২। Smith, George : Life of William Carey (1885), p. 257

৩৩। শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ : বাংলা সাহিত্য বঙ্গদর্শন (১২৮৭), পৃ. ৪৯৬

৩৪। সরকার, অক্ষয়চন্দ্র : নবজীবন, মাঘ (১২৯৫), পৃ. ২৭৭